মনোরমা।

-oo—-

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জয়পুর জেলার অন্তঃপাতী চন্দননগর গ্রামে হরিনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের আর অন্য কোন উপায় ছিল না। তাঁহারপত্নীর নাম কমলা, কমলা অত্যন্ত ধর্ম্মশীলা ও পতিরতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ সহধর্ম্মিণীর সদ্গুণে পরম সুখে কালযাপন করিতেন। কমলা সাংসারিক কর্ম্ম সকল এমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন, যে অতি অল্প আয় হইলেও তাহাদের কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। ব্রাহ্মণীর একমাত্র পুত্র ভিন্ন আর কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। পুত্রের নাম মনোরঞ্জন। মনোরঞ্জন যদি ও গৌরবর্ণ ছিল না, তথাপি তাহার মুখ নাসিকা নয়ন প্রভৃতি অঙ্গ সকল অতি মনোহর ছিল। অথবা বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন কি? তাহার যে গুণ ছিল তাহাতে সে সকলের মনোরঞ্জন করিয়া নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। তাহার সহাস্য বদন দেখিয়া এবং মিষ্ট কথা শুনিয়া সকলেই মোহিত হইতেন। মনোরঞ্জন অতিশয় মাতৃবৎসল ছিল, মাতাকে না বলিয়া কোন কর্ম্ম

করিত না। তাহার মাতা ও নয়নের পুত্তলী সন্তানটীকে একবার নয়নের অন্তরাল করিতেন না।

তাঁহাদের গ্রামে যে বিদ্যালয় ছিল, হরিনাথ বিদ্যাশিক্ষার জন্য পুত্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন। মনোরঞ্জন অতি সুবুদ্ধি ছিল, অল্প কাল মধ্যে সহচর বালকগণের অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিল। মনোরঞ্জন পাঠশালায় প্রতিদিন যে সকল নূতন পাঠ পাইত, গৃহে আসিয়া যত্নপূর্ব্বক অগ্রে সেই গুলি অভ্যাস করিত, এবং প্রত্যূষে উঠিয়া এরূপ মনোযোগের সহিত নূতন ও পুরাতন পাঠ সকল আবৃত্তি করিত, যে আদ্যোপান্ত তাহার মুখস্ত হইয়া যাইত। পাঠাভ্যাসের পর তাহার পিতার সহিত ক্ষেত্রে গিয়া কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিত। ব্রাহ্মণের তাদৃশ সঙ্গতি ছিল না, সুতরাং সকল কর্ম্মই তাঁহাকে স্বয়ং দেখিতে হইত। মনোরঞ্জন সাধ্যানুসারে পিতার সাহায্য করিতে ত্রুটি করিত না। পিতা পুত্রে ক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে ব্রাহ্মণ সমুদায় আয় ব্যয়ের হিসাব করিতেন ও অন্যান্য বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন, আর মনোরঞ্জন মাতার নিকট আসিয়া প্রফুল্ল মনে আহার করিত। তৎপরে বাজারে যাইয়া মাতার মতানুসারে নিত্য খরচের দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিত। পুত্রের প্রত্যাগমনের বিলম্ব হইলে ব্রাহ্মণী ব্যাকুল হইয়া মনে মনে আপন অদৃষ্টের প্রতি কত ধিক্কার দিয়া, কহিতেন “হায়! বাছা আমার কতই কষ্ট পাইতেছে। আহা! এমন কোমল শরীরে আমি কত কষ্ট দিতেছি।” মনোরঞ্জন বাজার

হইতে গৃহে আসিলে ব্রাহ্মণী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিতেন এবং তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিতেন। মনোরঞ্জন আপনি স্নান করিয়া পিতার জন্য তৈল লইয়া বহির্বাটিতে গিয়া পিতাকে তৈল দিত; তৎপরে আপনি ভোজন করিয়া যথাসময়ে পড়িতে যাইত। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিত্য পাঠ গুলি অভ্যাস করিয়া রাখিত। সুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষক যখন পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রেণীর অন্যান্য বালক অপেক্ষা মনোরঞ্জন উত্তম বলিতে পারিত। পরে শিক্ষক যখন নূতন পড়া দিতেন মনোরঞ্জন মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিত। যে সকল দুরূহ পাঠ একবারে বুঝিতে না পারিত, শিক্ষককে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা উত্তম রূপে বুঝিয়া লইত। তাহার সমপাঠী বালকেরা যদি কোন বিষয় বুঝিতে না পারিত তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে উহা বুঝাইয়া দিত। সকল বালক তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিত। তাহাকে না বলিয়া কেহ কোন কর্ম্ম করিত না। দুষ্ট বালকেরা ও মনোরঞ্জনের গুণে এবং মিষ্ট কথায় এমনি বশীভূত হইয়াছিল যে তাহারা ও আপনাদের স্বভাব ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিয়াছিল।

সমপাঠী বালকদিগের মধ্যে মনোহর নামে একটী বালক ছিল সে মনোরঞ্জনের ন্যায় সুশীল সচ্চরিত্র ও আর সকল বিষয়েও মনোরঞ্জনের অনুরূপ ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সদ্ভাব জন্মে। তাহারা একত্রে শয়ন, একত্রে অধ্যয়ন ও একত্রে ভ্রমণ করিত। যখন যাহা করিতে হইত উভয়ে মিলিয়া করিত। মনোহর ধনাঢ্য লোকের সন্তান, হইয়াও প্রতিদিন

মনোরঞ্জনদের বাটিতে আসিয়া পড়া শুনা করিত, কেবল আহারের সময় বাটী যাইত। মনোরঞ্জনের মাতা দেখি-লেন বালক দুইটী অনন্যমনে সকল সময় পাঠাভ্যাস করে এবং একটু অবসর পাইলেই আবার মনোরঞ্জনকে অনেক গৃহস্থালি কর্ম্ম করিতে হয়। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে মনোরঞ্জনকে এত পরিশ্রম করিতে দেওয়া কোন মতে উচিত নয়। ব্রাহ্মণী একদিন দেখিলেন দুইটী বালক আহার নিদ্রা ভুলিয়া একাগ্রচিত্তে কেবল পাঠাভ্যাস করিতেছে। মনোরঞ্জনের মাতা তাহা-দিগের নিকট যাইয়া কহিলেন "বাছারা আমার সর্ব্বদাই যে পড়িতেছ, না আমি কখন তোমাদিগকে এত পড়িতে দিব না। আহা! আমার মনোরঞ্জনের সে শরীর কি হই-য়াছে, বাছার শরীরটী আধ খানি হইয়া গিয়াছে।" তাহার পর মনোহরকে কহিলেন "বাছা! তুমি বড় মানুষের ছেলে এত কষ্ট করিয়া পড়িতেছ কেন? তোমার পিতার কিসের অভাব? মনোরঞ্জন যেন গরিবের ছেলে উহার বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই"। মনোহর মনোরঞ্জনের মাতার এই সকল কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল "মা! সকলেরি পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত। ধন অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব যে কত অধিক তাহা কি আপনি জানেন না? সে দিন আমরা পড়িয়াছি।

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

মনোরঞ্জনের মাতা বলিলেন "বাছা! এ শ্লোকের

অর্থ কি ?” মনোহর বলিল “ মা ! ইহার অর্থ বলি শুনুন রাজাও বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের তুল্য হইতে পারেননা, যেহেতু রাজা আপনার রাজ্যে পূজনীয়, কিন্তু বিদ্বান্ কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্র আদরণীয় হইয়া থাকেন। ”

ব্রাহ্মণী মনোহরের এই সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন , তথাপি তাহাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে নিবারণ করিয়া কর্ম্মান্তরে অন্য গৃহে গেলেন। পুত্রবৎসলা ব্রাহ্মণীর কর্ম্মে মন নাই, কেবল পুত্রের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন ; এবং মনে মনে কহিলেন যে মনোরঞ্জন এত পরিশ্রম করিয়া পড়িতেছে তথাপি বাছা আমার এক বার ও বলে না যে আমি এত গৃহস্থালি কর্ম্ম করিতে পারিব না। আমি যখন যাহা বলিতেছি তাহাই করিতেছে। ধন না থাকিলে কতই কষ্ট পাইতে হয়, আমি মা হইয়াও অর্থাভাবে বাছার এত কষ্ট দেখিতেছি। ব্রাহ্মণী এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় ব্রাহ্মণ নিকটে আসিয়া কহিলেন “ দেখ মনোরঞ্জন পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত শীঘ্রই কলিকাতা যাইবে, উহার দ্বারা আর আমাদের কোন সাংসারিক কর্ম্ম করান উচিত নয়। একটী দাসী রাখা কর্ত্তব্য-উহাকে যেরূপ পরিশ্রম করিয়া পড়িতে হইতেছে তাহাতে আর অন্য কর্ম্ম করিতে দেওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণী স্বামীর কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া কহিলেন নাথ ! এইমাত্র আমিও ঐ বিষয় ভাবিতেছিলাম। মনোরঞ্জনকে দেখিয়াছ? আহা ! উহার শরীরটি শুকাইয়া গিয়াছে ; আর

উহাকে পূর্ব্বের ন্যায় গৃহস্থালি কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইবে না।

তাঁহারা যত শীঘ্র পারিলেন অল্প বেতনে একজন দাসী নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণী দাসীটিকে অবলম্বন করিয়া সমুদয় কাজ করিতেন সুতরাং পুত্রকে আর পূর্ব্বের মত সাংসারিক কর্ম্ম করিতে হইল না। মনোরঞ্জন সময় অতিদুর্ল্লভ জ্ঞান করিত সুতরাং একমুহূর্ত্ত সময় ও বৃথা নষ্ট করিত না, সর্ব্বদা একমনে পাঠ করিত। এদিগে ব্রাহ্মণ কিসে পরিবারের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে, সর্ব্বদা তাহারি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হরিনাথের বাটীর অনতিদূরে দুর্গাচরণ নামে অপর একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার এক মাত্র কন্যা ভিন্ন আর সন্তান সন্ততি ছিল না। স্ত্রীর পতিপরায়ণতা গুণে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি একদা কলিকাতায় আপন কুঠিতে যান সেই সময় মনোরঞ্জন ও তাঁহার বন্ধু দুইজনে পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তাহারা থাকিবার নিমিত্ত বাসা ভাড়া না করিয়া দুর্গাচরণের নিকটেই রহিলেন। মনোরঞ্জনের পিতার সহিত দুর্গাচরণের সৌহৃদ্য ছিল, সুতরাং তিনি মনোরঞ্জন ও মনোহরকে আদরের সহিত নিকটে রাখিলেন। তাহাদের পরীক্ষা শেষ হইলে পর তাহারা দুর্গাচরণকে বাড়ী যাইবার ইচ্ছা

জানাইল। তাহাতে ব্রাহ্মণ কহিলেন ! বাপু "তোমরা কিছু বিলম্ব কর আমিও যাইব, আমার কিছু টাকার প্রয়োজন হইয়াছে.সেই জন্য এখানে আসিয়াছি অতএব আর দুই চারি দিনের মধ্যে সকল টাকা পাইব, পাইলেই তোমাদের সহিত বাড়ী যাইব"।

যদিও তাহাদের কর্ম্ম সমাধা হইয়াছিল তথাপি তাহারা ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসিবে বলিয়া তাঁহার অপেক্ষায় রহিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে দিন দিন নূতন নূতন সামগ্রী দেখাইতে লাগিলেন। তাহারা অনেক বিষয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছিল কিন্তু চক্ষে কখন দেখে নাই, ব্রাহ্মণ সেই সকল বিষয় তাহাদিগকে দেখাইতে ও বুঝাইতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং ব্রাহ্মণের প্রতি তাহাদের ভক্তি আরও বৃদ্ধি হইল। দুই তিন দিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণের সকল কর্ম্ম শেষ হইলে ব্রাহ্মণ বালক দুইটিকে কহিলেন, "তোমাদের দেখিবার আর কিছু ত বাকি নাই"? কল্য তবে বাড়ি যাই চল। মনোরঞ্জন বলিলেন "হাঁ। মহাশয় আমাদের সকল দেখা হইয়াছে।" ব্রাহ্মণ পরদিন বাটী যাইবেন স্থির করিয়া যাহা কিছু কাজ বাকি ছিল রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তৎসমুদায় সমাধা করিলেন। দুই প্রহরের পর শয়ন করিলেন। শেষ রাত্রে ব্রাহ্মণের হঠাৎ ভেদ বমি হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে মনোরঞ্জন এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া ব্রাহ্মণের এক জন কর্ম্মচারীকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল ইঁহাকে কে চিকিৎসা করিতেছেন? কর্ম্মচারী

কহিল নিকটই একজন কবিরাজ আছেন তিনিই চিকিৎসা করিতেছেন। কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা হইতেছে শুনিয়া মনোরঞ্জন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনোহরকে বলিলেন। ভাই ইহারা কি করিতেছে। "হায়? হায়! ইহারা ত ব্রাহ্মণকে মারিবার উপক্রম করিয়াছে, কলিকাতায় এত ভাল ডাক্তার থাকিতে একজন সামান্য কবিরাজের হাতে ইঁহাকে সমর্পণ করা কি উচিত? এখন বল দেখি কি করি!" মনোহর কহিল দেখ ভাই "আমার বড় পিসির ছেলে খুব ভাল ডাক্তার, তিনি কলিকাতাতেই আছেন অতএব আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসি তুমি ততক্ষণ উহাঁর নিকটে গিয়া তত্ত্বাবধান কর"। মনোরঞ্জন কহিল, "তবে ভাই! তুমি শীঘ্র গিয়া ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া আন"। ডাক্তার আসিয়া খুব যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রোগ এতদূর খারাপ হইয়াছিল যে কিছুতেই কিছু হইল না। কোন ঔষধিরই গুণ দর্শিল না। একদিকে যম—অপর দিকে মনোরঞ্জন, মনোহর এবং ডাক্তার তিন জনে টানাটানি করিতে লাগিলেন। হায় যখন শমন নিকটবর্ত্তী হয় তখন মনুষ্যের চেষ্টায় কি হইতে পারে? ক্রমে২ মৃত্যুর সমুদায় চিহ্নই ব্রাহ্মণের শরীরে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন মনোরঞ্জন ও তাহার বন্ধু উভয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িল। যত বেলা বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই রোগের যাতনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবং শরীর হীমাঙ্গ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণও আপন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া মনোরঞ্জনের হস্ত ধারণ করিয়া

কহিলেন "মনোরঞ্জন!" এই কথাটি অনেক কষ্টে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল। এই কথাটি মাত্র বলিয়া তিনি স্থিরনয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, বোধ হইল, যেন কোন ভাবি সুখের চিন্তা করিতেছেন; কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার মুখ অধিকতর প্রফুল্ল এবং উজ্জ্বল হইল; তৎপরে তিনি পুনর্ব্বার মনোরঞ্জনের হস্ত ধরিয়া বলিলেন "বাপু! তুমি আমার যেরূপ সেবা ও যত্ন করিয়াছ, পুত্রে পিতার এরূপ করে কি না সন্দেহ। আমি কায়মনো-বাক্যে জগৎপিতার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া জগতের মঙ্গল সাধন কর——আমি তোমাকে আর একটী অনুরোধ করিতেছি——আমার কন্যাটির মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধারণ করিও এবং ব্রাহ্মণীকে বলিও——আমি পরলোকে জগৎপিতার নিকট গমন করিলাম——তিনি যেন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া আত্মঘাতিনী না হন। আমি জানি ব্রাহ্মণী আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কখনই জীবন ধারণ করিবেন না; যে কোন প্রকারে হউক প্রাণ ত্যাগ করিবেন—" মনোরঞ্জনকে এই কয়েকটী মাত্র কথা বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তখন মনোরঞ্জন ব্রাহ্মণের অতি নিকটে গিয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ চক্ষু মুদিত করিয়া এক মনে পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন——আর তাঁহাকে চক্ষু উন্মীলন করিতে হইল না। মনোরঞ্জন দেখিলেন ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মুখকান্তির হ্রাস হয় নাই

মনোরঞ্জন তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়া মৃত্যু বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পুনঃ পুনঃ নাসিকাতে এবং বক্ষঃস্থলে হাত দিতে লাগিলেন; কিন্তু সকলি স্পন্দহীন বোধ হইল তখন মনোরঞ্জন জানিতে পারিলেন, ব্রাহ্মণ নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে মনোরঞ্জন অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং যথানিয়মে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিল।

ব্রাহ্মণের একটি প্রভুভক্ত চাকর ছিল, সে তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মনোরঞ্জনকে কহিল "বাবু মহাশয়! আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইল! হায়! মা ঠাকুরুণ এ কথা শুনিয়া কখনই সংসারে থাকিবেন না। হায়! মা আমাদের সংসারের লক্ষ্মী, তিনি বাড়ীতে আসা অবধি আমাদের বাবুর লক্ষ্মীলাভ হইয়াছিল। তিনি এক মুহূর্ত্ত বাবুকে না দেখিলে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেন, বাবুর কিছুমাত্র অসুখ হইলে তাঁহার কতই অসুখ হইত। এখন এই সংবাদ শুনিয়া তিনি যে কি করিবেন তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" মনোরঞ্জন প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া এবং তাহার পর আবার ভৃত্যের এই সমুদয় কথা শুনিয়া বুঝিলেন, যে তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষে যথার্থ প্রণয় ছিল। মনোরঞ্জনদের বাটীর কাছে দুর্গাচরণের বাটী ছিল বটে, কিন্তু মনোরঞ্জন গ্রামের কোন খবরই জানিত না। মনোরঞ্জন ব্রাহ্মণের কন্যাটির বয়স কত, কি নাম, এবং তৎসংক্রান্ত আরো অনেক কথা ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য কহিল তাঁহার বয়স——সাত বৎসর ও——নাম মনোরমা।

দুর্গাচরণের মৃত্যুর তিন দিবস পরে ভৃত্যের সহিত মনোহর ও মনোরঞ্জন গৃহে প্রত্যাগমন করিল। মনোরঞ্জন আপনাদের বাটীতে গিয়া পিতা মাতাকে এই সংবাদ শুনাইয়া দুঃখিত করিল। ভৃত্যটি মনোরঞ্জনদের বাটীতে আহারাদি করিয়া বৈকালে হরিনাথের সহিত মনোরঞ্জনদের বাটীতে গেল।

হায়! দুর্গাচরণের পরিবার এই আকস্মিক বিপদপাতের সংবাদ কিছুই জানেন না। ভৃত্য এবং হরিনাথ প্রথমে বাহির বাটীতে গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণেরসপ্তবর্ষীয়া কন্যাটী কতকগুলি বালিকার সহিত ক্রীড়া করিতেছে এবং নিকটে দাসী দণ্ডায়মানা আছে,——মেঘমালার মধ্যগতা বিদ্যুল্লতার ন্যায় সঙ্গিনীগণের মধ্যে মনোরমা শোভা পাইতেছে। সে হঠাৎ ভৃত্যকে দেখিয়া আহ্লাদে তাহার নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাহার কোলে উঠিয়া "বাবা কোই?" এই কথা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন ভৃত্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। দাসী তাহার ক্রন্দনে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্রমে পতিপ্রাণা ব্রাহ্মণীও পতির মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন, শুনিবামাত্র "হায়! আমার প্রাণেশ্বর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি আমার প্রাণ এ পর্য্যন্ত দেহে রহিয়াছে!!!" এই কথাটি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ছিন্ন মূল তরুর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনেক যত্নে তাঁহার মূর্চ্ছা দূর হইল বটে কিন্তু মূর্চ্ছান্তে তিনি নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শুনিয়া স্বামির মৃত্যু হতজ্ঞান প্রায়।
করিল বিলাপ কত বলা নাহি যায়॥
"কেন বা আমার পুন হইল চেতনা।
সেই শয্যা শেষ শয্যা কেনবা হলোনা॥
কে ঘূচালে মূর্চ্ছা মোর কে দিল চেতনা।
বাড়াইল হৃদেমোর দ্বিগুণ যাতনা॥
কে বল আসিয়া জ্বালা দ্বিগুণ জ্বালিল।
জ্বলন্ত অনলে কেবা ঘৃত ঢালি দিল॥
তিনি প্রাণ আমি কায়া জানে ত সকলে।
জানিয়া শুনিয়া কেন এমন ঘটালে॥
কেমন করিয়া বল সে পতি ছাড়িয়া।
ঘরেতে রহিব আমি মৃত্যু এড়াইয়া॥
শয়নে স্বপনে তাঁরে দেখি যে অন্তরে।
কেমনে রহিব আমি রাখিয়া অন্তরে॥
তাঁহার নিকটে যাই মনোসুখ পাই।
সামান্য সুখেতে কিছু প্রয়োজন নাই॥
শীঘ্র ছেড়ে দেরে মোরে যাই তাঁর কাছে।
বিলম্বেতে গেলে দেখা নাহি মিলে পাছে॥
স্ত্রীলোকের পতি ধন পতিই জীবন।
পতিহীনা স্ত্রীলোকের বৃথা যে জীবন॥
হায়! বিধি! এই তব বিধেয় বিচার।
বিচ্ছেদছুরিকা হৃদে মারিলে আমার॥
তব সনে করেছিনু কতই বিবাদ।
নির্জ্জনে পাইয়া বিধি সাধিলে কি বাদ?॥

আমার হৃদয় ধন করেছ হরণ।
প্রাণশূন্য দেহে আর কিবা প্রয়োজন ॥
অনুনয় করে বলি বধরে জীবন।
এছার দেহের ভার বহি অকারণ ॥
সলিলবিহীন কোথা আছে সরোবর।
শাখাশূন্য কে কোথা দেখেছ তরুবর ॥
আমি নারী অভাগিনী পড়ে কাঁদি একা।
এস এস প্রাণনাথ! এসে দাও দেখা ॥
হায়! প্রাণনাথ কেন হলে অদর্শন।
কেমনে থাকিব একা বলগো এখন ॥
এখনি মরিব আমি এনে দাও ছুরি।
প্রাণ বধ করে আমি দুঃখ দূর করি ॥
হায়! প্রাণনাথ কোথা গেলে পলাইয়া।
বিচ্ছেদছুরিকা মোর হৃদয়ে মারিয়া ॥
বলেছিলে সাবধানে ঘরে থাক প্রিয়া।
দিনেক দুদিন পরে আসিব ফিরিয়া ॥
সব বুঝিলেম এবে কেবল চাতুরী।
তুমিত পলালে নাথ আমি কিবা করি ॥
কেমন করিয়া বল ত্যজিবো জীবন।
হায়! প্রাণনাথ কেন হলে অদর্শন ॥
তোমার বিহনে, জগৎ দেখি অন্ধকার।
তোমা বিনা এ প্রাণেতে কি কাজ আমার ॥
দশদিক্ শূন্য দেখি তোমার অভাবে।
কে জানে এখনি তুমি পলাইয়া যাবে ॥

তোমা বিনা অন্য কিছু ভাল নাহি লাগে।
আমায় ফেলিয়া তুমি পলাইলে আগে ॥
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি চিন্তামণি।
তোমা বিনা আমি যেন মনিহারা ফণী ॥
চঞ্চল যেমন ফণী হারাইয়া মণি।
তোমা হারাইয়া আমি হয়েছি তেমনি ॥
মধুমাখা কথা সব আছে হৃদে গাঁথা।
না শুনে কেমনে রব সে সকল কথা ॥
কেমনে ভুলিব আমি সে সকল বাণী।
কর্ণ জুড়াত আমার শুনিয়া সে ধ্বনী ॥
পুর্ব্ব কথা সব নাথ! পড়িতেছে মনে।
কেমনে রাখিব প্রাণ তোমার বিহনে ॥
প্রাণ গেল! প্রাণ গেল! তব অদর্শনে।
তোমা শূন্য গৃহে নাথ! রহিব কেমনে ॥
আমারি কারণে নাথ! হারাইলে প্রাণ।
দেখা দাও প্রাণ নাথ! স্থির হোক প্রাণ ॥
আমার হৃদয় নাথ! তব বাসস্থান।
হৃদয় ছাড়িয়া কোথা করিলে প্রস্থান ॥
কি দোষ দেখিয়া নাথ! করিলে বর্জ্জন।
দোষ যদি করিতাম বলিতে তখন ॥
দিন মধ্যে শতবার দিতে দরশন।
ঘরে এস প্রাণনাথ! দেখি তবানন ॥
কতই যে মহাপাপ করেছি হে আমি।
যে পাপে হারানু আমি তোমা হেন স্বামী ॥

ক্ষুদ্র কর্ম্ম কর্ত্তে নাথ জিজ্ঞাসিতে যারে।
গুরুতর কাজে নাথ না শুধালে তারে ॥
হায়! বিধি তোর এ কি হইল বিচার।
ভাব দেখি একবার কি হল আমার ॥
হায় প্রাণনাথ! কোথা গেলে পলাইয়া।
যায় যায় প্রাণ যায় দেখা না পাইয়া ॥
হায়! প্রাণনাথ কেন হইলে এমন।
দয়া স্নেহ সব কিগো দিলে বিসর্জ্জন ॥
পাপী বলে বুঝি নাথ ঘৃণিলে আমারে।
নতুবা যাবার কালে বলিতে গো মোরে ॥
বিদেশে যাইয়া নাথ হারালে জীবন।
ঘরেতে রহিনু আমি সহিতে বেদন ॥
এসো এসো প্রাণনাথ দেও দরশন।
তব দরশন বিনা থাকি অকারণ ॥
সহায়বিহীনা নাথ রমণী অবলা।
সংসার-সাগর মাঝে স্বামী মাত্র—ভেলা ॥
সে ভেলা হারানু আমি নিজ কর্ম্ম দোষে।
বিধাতা দিলেন দণ্ড অতিশয় রোষে ॥
পাপী বলে যদি নাথ না শুন রোদন।
তব আদরের কন্যা করিছে ক্রন্দন ॥
পাওনা শুনিতে বুঝি উহার রোদন।
শুনিতে পাইলে কেন করিবে এমন ॥
অবলা সরলা বালা কি দোষ করিল।
নিরাশ্রয় হয়ে, ও যে ধূলায় পড়িল ॥

প্রাণের অধিক ভাল বাসিতে ইহারে।
এত যতনের ধন সমর্পিলে কারে॥
আপনার কষ্ট নাথ সহিবারে পারি।
মোদের কন্যার কষ্ট দেখিতে যে নারি॥
কোথায় ফেলিয়ে গেলে প্রাণের দুহিতা।
কোথায় রহিল তব দাসী এ বনিতা॥
কোথায় রহিল তব স্বোপার্জ্জিত ধন।
কোথায় রহিল তব দাস দাসী গণ॥
কোথায় রহিল তব হর্ম্ম্য অট্টালিকা।
কোথায় রহিল তব এ পুষ্প বাটিকা॥
সকল ফেলিয়ে তুমি কোথায় পলালে।
অভাগিনী কি করিবে কিছু না বলিলে॥
এমন কঠিন তুমি হৃদয় ধরিলে।
বিনা দোষে অবলারে প্রাণেতে বধিলে॥
কি দিব তোমায় দোষ বলিয়া নির্দ্দয়।
ততো ধিক নিদারুণ আমার হৃদয়॥
এমন কঠিন প্রাণ করেছি ধারণ।
এখন ত্যজিয়া দেহ করে না গমন ?॥
ধিক্ প্রাণ ধিক্ তোরে ধিক্ শতবার।
থাকিতে এ দেহে আর কি সাধ তোমার॥
পান করে হলাহল বেরো রে জীবন।
কি জন্য এখানে বল আছিস্ এখন॥

এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে পতি-প্রাণা কামিনী আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, আত্মহত্যা করিতে উদ্যত

হইলেন। পার্শ্বস্থ লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল; এবং নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিল। আহা! যথার্থ প্রণয়ীর মধ্যে স্ত্রী হউক, আর স্বামীই হউক, একজন অগ্রে পরলোক গমন করিলে দ্বিতীয় ব্যক্তির কি দশা হয়, তাহা প্রণয়ী ভিন্ন অনুভব করিবার আর কাহারো সাধ্য নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পতিহীনা ব্রাহ্মণী অবশেষে নির্জ্জন স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। নানা লোকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কোন প্রবোধেই প্রবোধিত হইলেন না। এক জন কর্ম্মচারী বহুকালাবধি তাঁহাদের বাড়ীতে ছিলেন; সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত মান্য করিত। তিনি ব্রাহ্মণীর নিকটে গিয়া নানা প্রকার জ্ঞানপূর্ণ কথাতে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—কহিলেন "বৎসে! উঠ উঠ কি করিবে সংসারের গতিই এইপ্রকার—সকলেই জন্ম মৃত্যুর অধীন—সকলি ঈশ্বরাধীন, মনুষ্যের কিছুমাত্র সাধ্য নাই। মৃত্যু সর্ব্বত্রই গমন করেন—তাঁহার অগম্য স্থান নাই। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেই কালের অধীন—মৃত্যুর নিকট কাহারও প্রভুত্ব নাই। অদ্য পিতা পুত্রকে দেখিয়া আহ্লাদে গদগদ হইতেছেন। আবার কল্য সেই পুত্রের মৃত শরীরোপরি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। অতএব বাছা! বলিতে কি, সকলকেই মৃত্যুর পথে গমন করিতে হইবে, তবে দুদিন অগ্রে আর দুদিন পরে

এই মাত্র প্রভেদ। মৃত্যুর নিকট কালাকালের বিচার নাই। জগতস্থ সমস্ত প্রাণীকে মৃত্যুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়। যত দিন তোমার অদৃষ্টে সুখ ছিল ভোগ করিয়াছ। বৎসে! তুমি ত সকলি জান, কেন অজ্ঞানের মত শোক করিতেছ? অদ্য ছয় দিন হইল তুমি জল পর্য্যন্ত পান কর নাই। মা! তুমি কি জান না, শরীরকে কষ্ট দিলে ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করা হয়, আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে পরম পিতার অত্যন্ত অপ্রিয় করা হয়? বৎসে! তুমি সকল জানিয়া শুনিয়া শোকে জগৎপিতার অপ্রিয়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? এই যে সংসার দেখিতেছ—এ কেবল মায়াময়! পরমেশ্বর মনুষ্যের উপকারের নিমিত্ত মনুষ্যের মনে নানা প্রকার প্রবৃত্তি দিয়াছেন, পরম করুণাময় জগৎপিতা যে সকল প্রবৃত্তি দিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে তৎসমুদয়ই আমাদের উপকারার্থ নিয়োজিত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া তিনি মনুষ্যকে পরীক্ষা করিতেছেন, এই জন্য সমাজ একটি পরীক্ষার স্থল মনে করিয়া কাজ করিতে হয়, দেখ মা! এই জগতে বালকেরা বহু পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া পরীক্ষা দিতেছে, যে বালকপরীক্ষো-ত্তীর্ণ হইতেছে, সে নানাপ্রকার পারিতোষিক ও প্রতিষ্ঠা-পত্র পাইয়া জনসমাজে আদরণীয় হইতেছে। যাঁহারা প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তাহারা মনে২ কতই দুঃখ করে এবং বলে—হায়! কেনই বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছিলাম—এবং মনে২ প্রতিজ্ঞা করে, যে এবার সময় নষ্ট না করিয়া পাঠে এমনি মনোনিবেশ করিব, যেন আগামী

বৎসর নিশ্চয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, কিন্তু বৎস! জীবনের এই শেষ পরীক্ষা বড় ভয়ানক! অনেক সহ্য না করিলে এ পরীক্ষাতে কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, এবং একবার ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে পুনরায় চেষ্টা করিব, এ আশাতেও নিরাশ হইতে হয়, পরমেশ্বর মনুষ্যকে সদসৎ প্রবৃত্তি দিয়া এই ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি বুদ্ধিমান্ হন তিনি মৃত্যুকে সর্ব্বদা সম্মুখীন জ্ঞান করিয়া বুদ্ধির সাহায্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া সেই চরম পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া দিব্যলোকে গমন করেন, এবং ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হন। যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তিসকলের বশবর্ত্তী হইয়া সামান্য সুখকে চিরস্থায়ী এবং সার বলিয়া জ্ঞান করেন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণোপযোগী পরিশ্রমকে সামান্য জ্ঞান করেন তিনি নিরয়গামী হন। অতএব বৎস! আর কেন শোকে মুগ্ধ হইয়া জগৎপিতার অপ্রিয়াচরণে প্রবৃত্ত হও? সাবধান! সাবধান! মৃত্যু প্রতিক্ষণেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, জানিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল সমাধা কর।

আহা! মনোরমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি; উহার কি অবস্থা হইয়াছে। উহাকে প্রবোধ দাও। একে উহার পিতৃবিয়োগকষ্ট, তাহাতে আবার তোমাকে এইরূপ দেখিয়া আরো কাতর হইতেছে। এক্ষণে ইহার সমুদয় সুখ দুঃখ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। ইহার সমুদয় ভার পরমেশ্বর তোমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। আহা! কন্যাটিও ত সামান্য কন্যা নয়, উহার এক একটা বুদ্ধির কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। পরমেশ্বর

যদি ইহাকে বাঁচাইয়া রাখেন, তাহা হইলে ইহা দ্বারাই তোমার বংশ উজ্জ্বল হইবে। এই তোমার বংশধর, উহাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দাও এবং সৎপাত্রে সম্প্রদান কর; সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যে সকল কর্ত্তব্য তাহা কর, এবং সৎপথে থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। আহা! দেখ দেখি বালিকাটির কি দশা হইয়াছে, আর সে লাবন্য নাই, সে কান্তি নাই—উহার মুখ খানি দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়—আহা! যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছে। হায়! ঐ পিতৃমাতৃবৎসলা বালার কি দশা হইয়াছে। হা বিধাত! নব কুসুম বৃক্ষের জল সেচ-নোপায় অবরোধের ন্যায়, এই সুকুমারী কুমারীর কি পিতৃহীন হইবার সময়!! মা তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর! স্থির হও, উঠ! উঠিয়া উহাকে নিকটে ডাক”।

ব্রাহ্মণী বৃদ্ধের এই সমুদয় কথা শুনিয়া কহিলেন “পিতঃ! আমি আপনার সকল কথা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং আপনার সদুপদেশ ধারণ করিতে পারিতেছে না। হায়! আমার হৃদয় ভাণ্ডার যে প্রাণনাথের চিন্তাতেই পরিপূর্ণ হইয়াছে, অপর কোন চিন্তা মনোমধ্যে স্থান পাইতেছেনা। আহা! সেই নয়না-ভিনন্দন চন্দ্রবদন, শ্রবনাভিরঞ্জন মধুর বচন, ও সেই প্রীতি-প্রফুল্ল স্নিগ্ধ নয়ন যে আমার মনে জাগরুক রহিয়াছে। —হায়! ও হতভাগিনী কন্যাটীর কথা কি বলিতেছেন? ঐ হতভাগিনীর অদৃষ্টে যদি সুখ থাকিত, তাহা হইলে কখনই এমন হইত না। জানি না উহার কপালে কতই কষ্ট

আছে!—হায়! উহার জন্যই এ দগ্ধ প্রাণ এখনো রাখিয়াছি; নতুবা এতক্ষণ এ সংসার হইতে অপসৃত হইয়া সকল দুঃখ নির্ব্বাণ করিতাম। জানি না সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতা কি অভিপ্রায়ে উহার সৃজন করিয়াছেন—কেন আমাকে ও সকল কথা বলিতেছেন?—আমার বোধশক্তি প্রাণনাথের সহিত গমন করিয়াছে, কেবলমাত্র কষ্টভোগ করিবার নিমিত্ত এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি; এখন আর আমাকে কেহ কিছু বলিবেন না—মনোরমার ভার মহাশয়ের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম—আমি আর উহার ভাল মন্দ কি বিচার করিব। আর্য্যপুত্র দেবলোকে গমন করিয়াছেন, এখন আমি তাঁহার অনুগামিনী হই। সংসারসুখ তাঁহার সহিত সমাপ্ত হইয়াছে"।

এই কথা বলিয়া পতিপ্রাণা ব্রাহ্মণী সেখান হইতে উঠিয়া তাঁহাদের বাটীর নিকট যে পুষ্পোদ্যান ছিল সেইখানে যাইবার উদ্‌যোগ করিলেন; উদ্যানটি ব্রাহ্মণের বড় প্রিয়স্থান ছিল। তিনি উদ্যানের অনেক কর্ম্ম স্বহস্তে করিতেন এবং যেখানে কোন নূতন লতা বা ভাল পুষ্পবৃক্ষ দেখিতেন, অমনি আপন উদ্যানে রোপণ করিতেন, আহা! বাগানের কি অপূর্ব্ব শোভাই সম্পাদন করিয়াছিলেন, দেখিলে নয়ন চরিতার্থ হয়, উদ্যানের চারিদিকে প্রাচীর, দুই পার্শ্বে দুইটি দরজা, একটী দরজা সর্ব্বদাই খোলা থাকিত, আর একটী প্রায় রুদ্ধ থাকিত। দরজার ভিতর দুইপার্শ্বে দুইটি ঝাউগাছ, বাহিরে দুইটী শালগাছ ছিল, বাগানের মধ্যে একটি মন্দিরে রামসীতার প্রতিমূর্ত্তি

ছিল। মন্দিরের সম্মুখে একটী কূপ তাহার চতুষ্পার্শ্বে রাধালতা মাধবীলতা এবং ঝুমকালতা ইত্যাদিনানা-প্রকার কুসুমলতিকায় বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। যখন উদ্যানস্থ বৃক্ষগুলি ফলভরে অবনত হইত এবং লতা সকল সুগন্ধ কুসুমে বিকসিতা হইত, পক্ষী সকল এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া মধুর স্বরে গান করিত এবং ঝাউগাছের হুহু শব্দ সুশ্রাব্য বাদ্যের ন্যায় কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, তখন উদ্যানের ভিতর যাইয়া অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলে মনে হইত যেন বৃক্ষগুলি নির্ভয়ে জগৎ পিতার গুণ গান করিতেছে—আহা! পক্ষীগুলি যেন গায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া, ঝাউ-গাছগুলি বাদ্যকরের কর্ম্ম করিয়া এবং শালবৃক্ষ দুইটি দ্বারবানের কার্য্য সাধন করিয়া, উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল।

ব্রাহ্মণ প্রতি দিবস সন্ধ্যার পর ধর্ম্মপত্নীর সহিত উদ্যানে গিয়া রামসীতা দর্শন করিতেন এবং কতক ক্ষণ রামগুণ গান করিয়া উভয়ে বৃক্ষ ও লতার তলে ভ্রমণ করিতেন, বৃক্ষগুলি ফলভরে অবনত এবং লতা সকল ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া বৃক্ষকে আশ্রয় করিতেছে দেখিয়া উভয়ে প্রণয় সংক্রান্ত নানা কথা কহিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণী একাকিনী উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিলে, শোকানল দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, পাগলিনীর ন্যায় নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন—"হায়! এই সন্ধ্যা আগতপ্রায়

এসময় প্রাণনাথের সহিত এই উদ্যানে কতই সুখানুভব করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে সেই সকলি রহিয়াছে কেবল আমার হৃদয়বল্লভ অভাবে এ উদ্যান শ্মশানসমান বোধ হইতেছে।

হায়! আমি ভিন্ন সবে, দেখি হর্ষময়।
রবির কিরণে দেহ—আর না দহয়॥
সূর্য্য গেছে অস্তাচলে রৌদ্র আর নাই।
ঝাউ গাছে বায়ু বহে করি সাঁই সাঁই॥
ভূতল শীতল হ'ল শরীর জুড়ায়।
গাছে বসি পাখিগণ বিভু গুণ গায়॥
আহা মরি ফুল গাছে ফুটে কত ফুল।
মিষ্ট ভাসে চারি দিক্ করেছে আকুল॥
সকলেই সুখী এবে দুঃখ কারো নাই।
পরম পিতার কাজে মেতেছে সবাই॥
ঐ যে আঁমের ডাল নড়ে বায়ু ভরে।
দেখ দেখ তাঁর পদে নমস্কার করে॥
আহা মরি ঝিঁঝিঁ পোকা করে ঝিঁঝিঁ রব।
দল বাঁধি করিতেছে ঈশ্বরের স্তব॥
হায়! প্রাণনাথ হেথা হও অধিষ্ঠান।
উভয়ে মিলিয়া করি বিভুগুণ গান॥
একাকিনী হেতা আশা উচিত না হয়।
বৃক্ষ লতা যত দেখি প্রেমানন্দময়"॥

এই মত বহুবিধ বিলাপ করিয়া আপন আত্মীয়বর্গকে কহিলেন—"দেখ! যে পর্য্যন্ত আমার দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত

না হয় তদবধি আমি এই উদ্যানেই বাস করিব, তোমাদের সকলকে বিনয় করিয়া বলিতেছি পুরুষমাত্রে যেন এ উদ্যানে না আসেন, আমি সংকল্প করিয়াছি যে পুরুষের মুখাবলোকন করিব না”। এই কথাগুলি বলিয়াই তিনি উদ্যানস্থিত রামসীতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, রামসীতার মূর্ত্তি দর্শন করিয়াই তাঁহার শোকানল দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, কিয়ৎ ক্ষণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়-মানা রহিলেন, মুখ হইতে একটিও কথা নির্গত হইল না, তৎপরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

“তুমি সতী পতিব্রতা জানিয়া গো! আমি।
আশ্রয় লইলাম মাগো! হারাইয়া স্বামী॥
অপার মায়ের গুণ কে বর্ণিতে পারে।
যে গুণে বাধিত তুমি করেছ রামেরে॥
যখন হরিল দুষ্ট রাজা দশানন।
“রাম! রাম!” বলে তুমি করিলে রোদন॥
মায়েরে ভুলাতে পারে হেন সাধ্য কার।
রঘুনাথ নিকটেতে মন বাঁধা যাঁর॥
যখন পাইলে কষ্ট অশোকের বনে।
রাম নাম, রূপ সদা করে ছিলে মনে॥
যখন আসিয়া রাবণ দিলেক যন্ত্রণা॥
ভজেছিলে রাঘবে না হয়ে—অন্যমনা॥
যখন করিলেন রাম উদ্ধার তোমারে।
প্রণয়পূর্ণ আলিঙ্গন করিলে তাহারে॥

ভেবেছিলে মা, তব কষ্টের হ'ল শেষ।
জানি না মা কি হইবে ভাগ্যে অবশেষ॥
বনে পাঠালেন রাম তোমারে যখন।
অদৃষ্টের দোষ দিয়া করিলে রোদন॥
পতির আজ্ঞাতে তুমি ছাড়ি রাজ্যাসন।
আশ্রয় করিলে বাল্মীকের তপোবন॥
বাল্মীকে ডাকিলে তুমি পিতা সম্বোধনে।
শ্রীরাম চন্দ্রের বংশ রক্ষার কারণে॥
প্রসবিলে কুমার দ্বয় সেই তপোবনে।
পালিলে তাদের তুমি কত গো যতনে॥
তাহাদের কষ্ট মাগো দেখিয়া নয়নে।
শ্রীরাম চন্দ্রের নিন্দা না করিলে মনে॥
"রাম নাম" জপে মাগো অস্থি কল্লে সার।
তোমার সমান সতী হয় সাধ্য কার॥
পতি-পরায়ণা জেনে লইলাম স্মরণ।
কৃপা করি দাও মাগো ও রাঙ্গা চরণ॥

তৎপরে উদ্যানে যে একটী সামান্য গৃহ ছিল, সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, দিনান্তে একবার সকল বৃক্ষের তলায় বেড়াইতেন, এবং যে কোন বৃক্ষতলে যে কোন ফল পড়িয়া থাকিত তাহাই লইয়া ভোজন করিতেন এবং কূপের জল তুলিয়া পান করিতেন। তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া সর্ব্বদা অনন্যমনে পতির চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে কন্যাটীকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে, সন্ধ্যার পর তাহাকে উদ্যানে আনাইয়া ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া

অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, এক এক বার তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাপিতহৃদয় শীতল করিতেন, কখন বা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন; "মা! তুমি অনাথিনীর কন্যা, তোমাকে রক্ষা করে মর্ত্ত্যলোকে এমন কেহ নাই। কেবল মাত্র এক অনাথনাথ তোমার রক্ষা কর্ত্তা, তুমি তাঁহার কৃপায় নিরাপদে থাকিবে, আমি আর তোমায় কি বলিব। হায়! তোমায় বক্ষে ধারণ করিয়া দগ্ধহৃদয় শীতল করি, মা! তুমি যে আমার কত আদরের ধন এখন, অনাশ্রয়া হইয়া দুঃখিনীর ন্যায় কাল যাপন করিতেছ। এ দুঃখ সেই দীনবন্ধু ব্যতীত দূর করিবার আর কাহারো সাধ্য নাই, তিনি ভিন্ন মনোরমার অন্য আশ্রয়বৃক্ষ নাই"।

এইরূপ কিছুক্ষণ প্রাণাধিকা কন্যাকে নিকটে রাখিয়া বিদায় করিয়া দিতেন। কন্যাকে বিদায় দিয়া পাগলিনীর ন্যায় কতকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতেন,—পতিপ্রাণা স্ত্রীলোকের পতি বিয়োগ হইলে যে রূপে কালাতিপাত করা উচিত, তাহাই করিতে লাগিলেন।

বিপদ্‌কালে বন্ধুজনের সান্ত্বনা করা ও প্রবোধ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া মনোরঞ্জনের মাতা এক দিবস সায়ংকালে দাসী সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাটীতে গিয়া দেখিলেন মনোরমা আপন পিতৃস্বসার কোলে বসিয়া মায়ের নিকট কত ক্ষণে যাইব এই কথা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছে, মনোরমার পিসি মনোরঞ্জনের মাতাকে দেখিয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া আপনাদের দুঃখের কথা জানাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী সংসারে

তাচ্ছিল্য করিয়া উদ্যানে বাস করিতেছেন বলিয়া অধিক দুঃখ করিতে লাগিলেন, আরো বলিলেন "আচ্ছা ভাই এ সংসারে পতি লইয়া কে কোথায় যাবজ্জীবন কাটাইতে পারিয়াছে? এরূপ সৌভাগ্য সহস্রের মধ্যে এক জনের হয় কি না সন্দেহ। সকলেই যদি পতি বিয়োগে সংসারে ঔদাস্য করিয়া বনগামিনী হইত তাহা হইলে আর সংসার চলিত না।„

মনোরঞ্জনের মাতা তাঁহার নিকট এই সম্বাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। মনোরমার পিসি মনোরঞ্জনের মাতাকে সঙ্গে লইয়া সেই বাগানে গমন করিলেন। তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণী নয়ন মুদ্রিত করিয়া রাম-সীতার সম্মুখে বসিয়া জপ করিতেছেন, ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে, মনোরঞ্জনের মাতা পূর্ব্বে এক বার এই বাগান দেখিয়াছিলেন, তৎকালে বাগানের কি অপূর্ব্ব শোভাই ছিল, কিন্তু এক্ষণে এইরূপ দশা দেখিয়া তিনি হুহু করিয়া কাঁন্দিতে লাগিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণীকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে দেখিয়া, সেখানে আর গোলযোগ না করিয়া মন্দিরের দ্বারে আসিয়া তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন; ব্রাহ্মণী সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মনোরমার পিসি মনোরমাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন এবং তৎপার্শ্বে আর একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। দেখিয়া কে কিছু বুঝিতে না পারিয়া

মনে মনে বিরক্ত হইলেন, পরে নিকটবর্ত্তিনী হইবামাত্র মনোরঞ্জনের মাতাকে চিনিতে পারিয়া, সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভগিনি! এ অনাথিনী হতভাগিনীকে কি দেখিতে আসিয়াছেন? হায়! এ পাপিয়সীকে দেখিলেও পাপ হয়, জানি না পূর্ব্ব জন্মে কত মহাপাপ করিয়াছিলাম, নতুবা এ যাতনা সহ্য করিতে হইবে কেন? উঃ বিধাতার নিকট কত অপরাধ করিয়াছি বলিতে পারি না!! কি আশ্চর্য্য যে এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও কঠিন প্রাণ দেহ হইতে অপসৃত হইতেছে না"!

মনোরঞ্জনের মাতা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া এবং শোক-গর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তাহাকে প্রবোধ দেওয়া দূরে থাক, নিজে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, এবং অবিরত নয়নাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কহিলেন, "ভগিনি! তোমাকে আর কি বলিব, তুমিত সকলি জান; কেবল এইমাত্র বলিতেছি, তুমি সকল বিষয়ে ঔদাস্য করিলে চলিবে কেন? তোমার একটী কন্যা রহিয়াছে উহার যাহাতে কষ্ট না হয় তাহা তোমার করা কর্ত্তব্য। আহা! কন্যাটীর যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহার সুখ দুঃখ তোমাতেই নির্ভর করিতেছে। অতএব যে পর্য্যন্ত না উহাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ, সে পর্য্যন্ত তোমার সংসারে থাকা কর্ত্তব্য"। পতি-বিয়োগ-বিধুরা ব্রাহ্মণী এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিলেন, "ভগিনি! আপনি যাহা বলি-লেন সকলি যথার্থ, বোধ হয় আমিও কন্যাটীর জন্যই

এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি, নতুবা যে দণ্ডে প্রাণনাথ আমাকে ত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, সেই দণ্ডেই জীবিতনাথের অনুগামিনী হইতাম। হায় আমি কি নিদারুণ! আমার কি কঠিন প্রাণ! নতুবা জীবিতনাথ ব্যতিরেকে এখনো জীবিত রহিয়াছি? হায়! আমার আর এ প্রাণ ধারণের প্রয়োজন কি? সেই প্রাণনাথই আমার জীবনসর্ব্বস্ব। সমুদয় আশা ভরসা, সুখ দুঃখ সেই হৃদয়-বল্লভের সহিত লয় পাইয়াছে। কেবল তাঁহার কন্যা কষ্ট পাইলে, কি জানি যদি তিনি পরজন্মেও আমার প্রতি বিরক্ত হন, এই ভয়ে জীবিত রহিয়াছি। যাহা হউক এখন উহার একটা আশ্রয় করিয়া দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হই। আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তবে আমার নিরাশ্রয়া কন্যার আশ্রয় হয়। আপনি যদি দয়া করিয়া মনোরঞ্জনের সহিত মনোরমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমাকে এই গুরুতর চিন্তা হইতে মুক্ত করা হয়"! মনোরঞ্জনের মাতা এই সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। কারণ তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না, যে মনোরমার মাতা নির্ধন মনোরঞ্জনের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন, এক্ষণে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে তাঁহার কথার কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি নিরুত্তর আছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণী কহিলেন "ওগো তুমি কি এ হতভাগিনীর কন্যার সহিত তোমার মনোরঞ্জনের বিবাহ দিতে অসম্মত হইতেছ"? মনোরঞ্জনের মাতা লজ্জিতা হইয়া বলিলেন; "সে কি আপনি এরূপ বিবেচনা করিবেন না, মনোরমার সহিত

মনোরঞ্জনের বিবাহ ত আমারি প্রার্থিত, তজ্জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে হইবে কেন? মনোরঞ্জন ত আপনারি, যদিও আমাদের এখন মনোরঞ্জনের বিবাহ দিবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু যদি মনোরমার সহিত মনোরঞ্জনের বিবাহ হয় তাহা হইলে আপনি যখন বলিবেন, সেই ক্ষণেই বিবাহ দিব"। তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময় দাসী আসিয়া মনোরঞ্জনের মাতাকে কহিল— "মাতাঠাকরুণ! রাত্রি অধিক হইয়াছে বলিয়া মনোরঞ্জন বাবু স্বয়ং আসিয়াছেন"। পুত্র আসিয়াছে শুনিয়া ব্রাহ্মণী মনোরমার মাতার নিকট বিদায় লইয়া পুত্র এবং দাসী সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মনোরমার মাতা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

কিছু দিন পরে মনোরমার পিসিকে কহিলেন "দেখ আর কেন বিলম্ব কর, মনোরঞ্জনের সহিত মনোরমার বিবাহ দিবার উদ্‌যোগ কর। একখানা পত্র লিখিয়া মনোরঞ্জনের পিতার নিকট পাঠাইয়া দাও"। মনোরমার পিসি বাটীর কর্ম্মচারিকে আহ্বান করিয়া মনোরমার বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত কথা বলিলেন এবং মনোরঞ্জনের পিতাকে একখান পত্র লিখিতে বলিলেন। কর্ম্মচারী একখানি পত্র লিখিয়া এক জন ভৃত্যের দ্বারা পত্রখানি মনোরঞ্জনের পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হরিনাথ পত্র পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং পত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণীকে শুনাইলেন। ব্রাহ্মণী পত্রার্থ অবগত হইয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন, এবং স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! মনোরঞ্জন

আমার যেমন সুশীল, সচ্চরিত্র মনোরমাও তদনুরূপ অতএব ইহাদের উভয়ের মিলন পরম সুখের হইবে। আহা! মেয়েটীকে দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, মেয়েটী ছেলে মানুষ কিন্তু তাহার গুণ এক মুখে বর্ণন করা যায় না, মনোরঞ্জন আমার সুবোধ ছেলে, এই জন্যই মনোরমার মা তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, নতুবা তিনি কদাচ গরিবের ছেলের সহিত কন্যার বিবাহ দিতেন না। তুমি এই দণ্ডেই বিবাহে সম্মতি দিয়া পত্রের উত্তর দাও"। ব্রাহ্মণ পত্রের উত্তর লিখিয়া পত্রবাহকের হস্তে দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

মনোরঞ্জন স্কুল হইতে গৃহে আসিয়া মায়ের নিকট গিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণী পুত্রকে খাবার দিয়া নিকটে বসিলেন, এমন সময় মনোহর আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় কমলা পুত্রের কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন "মনোহর! আজ দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী হইতে পত্র লইয়া একজন ভৃত্য আসিয়াছিল, সেই পত্রে মনোরঞ্জনের সহিত মনোরমার বিবাহের কথা লেখা ছিল, তোমাদের কি ইচ্ছা?" মনোহর মনোরমার সহিত মনোরঞ্জনের বিবাহ হইবে শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং কহিলেন, এ বিষয়ে আর অন্যমত কি, ইহাত উত্তম সম্বন্ধ হইয়াছে। মনোরঞ্জন লজ্জায় নতমুখ হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের কথা সমাপ্ত হইলে, দুই বন্ধুতে বাহিরে গেলেন, এবং বিবাহ সম্বন্ধে নানা তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মনোরমার মাতা কন্যার বিবাহের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি আর বিলম্ব না করিয়া বাটীর সকলকে বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে কহিলেন; তদনুসারে বিবাহের দিনস্থির করিয়া মনোরঞ্জনদের বাটীতে লোক পাঠাইলেন। মনোরঞ্জনের পিতা সেই দিনেই মত দিলেন।

যে দিন স্থির হইয়াছিল, সেই দিন মনোরঞ্জনের পিতা আপন আত্মীয় কুটুম্বদিগকে আনয়ন করিয়া শুভক্ষণে শুভ লগ্নে পুত্রের বিবাহার্থ পুত্রকে দুর্গাচরণের বাটিতে লইয়া গমন করিলেন। এ দিকে মনোরমার মাতা বহুমূল্য যৌতুক দিয়া মনেরঞ্জনকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। হরিনাথ পুত্রের বিবাহ দিয়া বরকন্যা স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। কমলা পুত্রবধূর মুখাবলোকন করিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। কমলার কন্যা ছিল না; তিনি বধূটীকে দুহিতার ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিতে লাগিলেন। মনের মত বধূ পাইয়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের আনন্দের সীমা রহিল না।

হায়! মনুষ্যের সুখ "নলিনী-দল-গত জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর" মনোরঞ্জনের মাতা পুত্রের বিবাহ দিয়া পর-মাহ্লাদে কালযাপন করিতেছিলেন, এমন সময় হটাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইলেন। মাতৃবৎসল মনোরঞ্জন মাতৃ-বিয়োগে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন ও জগৎ অরণ্যবৎ বোধ করিতে লাগি-লেন। মনোরঞ্জনের মনে কত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল,

কোথায় যাইব, কি করিব, আর এ সংসারে থাকিয়া প্রয়োজন কি? কে আর আমাকে আদর করিবে? হায়! কেই বা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে যারপর নাই সুখীবোধ করিবে? আমাকে প্রফুল্ল দেখিয়া কে আর প্রফু-ল্লিত হইবে? আমার মুখ মলিন দেখিয়া আর কাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে? আমার সৎকর্ম্ম দেখিয়া আর কে আহ্লাদে গদগদ হইয়া আমার মুখচুম্বন করিবে? আমার অপকর্ম্ম দেখিয়া আর কে আমায় স্নেহ-মধুর বচনে হিতোপদেশ দিবে?—হায়! আমার অসুখের সময় আর কে তেমন অসুখী হইবে? আমার সামান্য অসুখে তুমি যে কত অসুখ বোধ করিতে, আমার একটু মনোবিকার হইলে তুমি যে আমার মন প্রকৃতিস্থ না হইলে নিকট হইতে দূরে যাইতে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক দিন মনোরঞ্জন আপন বন্ধুর নিকট মাতার কথা উত্থাপন করিয়া, এমনই দুঃখ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার কথাতে সুবুদ্ধি মনোহর বুঝিতে পারিলেন মনোরঞ্জনের সকল বিষয়ে ঔদাস্য জন্মিয়াছে, এবং মনও যৎপরোনাস্তি খারাপ হইয়াছে। মনোহর বলিলেন "সখে! তুমি যাহা বলিলে আমি শ্রবণ করিলাম, কিন্তু শুনিয়া যে কত দূর দুঃখিত হইলাম তাহা অব্যক্ত। তোমার কথা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে তোমার নির্ম্মল বুদ্ধি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় এবং বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিত হইয়াছে।

শান্ত হও, এত অধৈর্য্য হইলে চলিবে না। প্রথমে তোমার পিতাও তোমার ন্যায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছেন। মনুষ্যের প্রকৃতিই এইরূপ, কোন প্রকার শোক উপস্থিত হইলে, প্রথমে যত শোকাকুল হয়, কিছু দিন গত হইলে সেই শোক আর তত দুঃখদায়ক হয় না”।

মনোরঞ্জন বন্ধুর এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং মনুষ্যকে অকৃতজ্ঞ জ্ঞান করিয়া দুঃখে, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন— "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা কি যথার্থ? মনুষ্য কি ক্রমে ক্রমে দুঃখক্ষোভ বিস্মৃত হয়? এমন কখনই হইতে পারে না—হৃদয়বিদারণ শোক বিস্মৃত হইয়া আহ্লাদে কালাতিপাত করে? যদি এ কথাই সত্য হয়, তবে এরূপ মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। আমার কি এমত সময় উপস্থিত হইবে, যে আমি স্নেহময়ী জননীকে বিস্মৃত হইয়া সুখে আসক্ত হইব? তবে যদি পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন হয়, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি মাকে দেখিতে পাই, তবেই ত আমার মনের পরিবর্ত্তন হইবে, নচেৎ কোন মতেই জননীর অদর্শন কষ্ট দূর হইবে না”।

মনোহর বন্ধুর এই সমস্ত কথা শুনিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে ইহাকে এপ্রকার কথায় প্রবোধ দিলে কিছুমাত্র ফল দর্শিবে না, বরং শোক-নদী আরও প্রবল হইয়া উঠিবে, সুতরাং ইহার মন অন্য দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করি।

এই ভাবিয়া মনোহর বলিলেন। "দেখ ভাই! তুমি অনর্থক চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ; মাতৃশোকে সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিলেই কি ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করা হয়? দেখ শোকে দুঃখ দমন করিয়া যথা-সাধ্য পরোপকার করা এবং সাধ্যানুসারে গুরুজনের সন্তোষ সাধন করা, মৃত জননীর মঙ্গলার্থ আর আপন জন্ম সার্থক করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা কি অধার্ম্মিকের কর্ম্ম? প্রিয়জনকে বিস্মৃত হইয়া অধর্ম্মাচরণ করাই দোষ, কিন্তু প্রবল শোককে শান্ত করিয়া ন্যায়ানুগত কার্য্য করা কদাচ দোষ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। বিবেচনা করিয়া দেখ পূর্ব্বে তুমি সর্ব্বদাই দেশের হিতচিন্তায় তৎপর থাকিতে, এবং কিসে দেশের উন্নতি হয় তদ্বিষয়েই সদাসর্ব্বদা পরামর্শ করিতে, কিন্তু হায়! সে সকল কথা এক্ষণে তোমার মুখে শ্রবণ না করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, সর্ব্বদাই তুমি উদাসীনের ন্যায় বেড়াইতেছ, কোন কর্ম্মে আর তোমার সাহস বা উৎসাহ নাই। সর্ব্বদাই চিন্তায় মগ্ন আছ, তোমার এই রূপ ভাব দেখিয়া সকলেই তোমার নিন্দা করিতেছে। তুমি কি জান না পূর্ব্বে যাঁহারা তোমাকে বুদ্ধিমান্ ও শান্ত বলিয়া কত প্রশংসা করিতেন এক্ষণে তাঁহারাই তোমায় পাগল বলিয়া স্থির করিয়াছেন? আর দেখ ভাই! সংসা-রের নায়াই এইরূপ! মাতৃক্রোড়ে কি কেহ চিরদিন কালাতিপাত করিতে পারেন? এই সংসারে মাতৃ-

সন্নিধানে যে সুখ পাওয়া যায়, তদ্রূপ সুখ অন্য কাহারো নিকট পাওয়া যায় না সত্য বটে, কিন্তু তজ্জন্য কি একবারে অধৈর্য্য হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য? সখে! মনে করিয়া দেখ, তুমি পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়াছ আর তুমি স্বাধীন নাই, এখন মনোরমার যাবজ্জীবনের সুখ দুঃখ কেবল তোমার সুখ স্বচ্ছন্দতার উপরেই নির্ভর করিতেছে—স্মরণ করিয়া দেখ, বিবাহকালীন যে সমুদায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছিলে, তাহার অর্থ কি?—হয়ত বিবাহ খুব সুখের বিষয়—নচেৎ বিবাহই নরকের দ্বার-স্বরূপ!! মহাত্মা ধার্ম্মিক পুরুষেরা প্রাণপণে বিবাহ-সময়কৃত অঙ্গীকার পালনে যত্নবান্ হন, সে বিষয়ে যত্নবান্ না হইলে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। অতএব এইরূপ চিন্তানল প্রজ্বলিত করিয়া, স্বকীয় শরীর দগ্ধ করিয়া স্ত্রীর প্রিয় সাধন করিতেছ, না স্বামীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছ? তুমি এই মাত্র বলিলে যে "মাতা যখন স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন তখন আমি মরিলেইবা কাহার কষ্ট, এবং জীবিত থাকিলেইবা কাহার সুখ? আমার জীবন মরণ উভয়ই সমান"। সখে! তোমার কি এ সকল কথা বলা উচিত? আর অধিক কি বলিব আমার বোধ হয় মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে তোমার এ সকল কষ্ট দূর হইবার সম্ভাবনা নাই—সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক ও পতি-ব্রতা রমণীর যে সকল গুণ থাকিতে হয়, সেই সকল গুণ যদি মনোরমার থাকে তাহা হইলে তোমার মনোবেদনা অবশ্যই দূর হইবে।"

মনোরঞ্জন বন্ধুর কাথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "সখে! তুমি আমার মনোবেদনা দূর করিবার উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ, তবে আর কি? অদ্যাবধি তুমিও নিশ্চিন্ত হইলে। মনু! তুমি কি জান না যে মনোরমাও আমার এক মহাচিন্তা হইয়াছে? যদি বিবাহ না করিতাম তাহা হইলে কি এত অসুখী হইতাম? সেই যে আমার অসুখের প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি অতি অপদার্থ, ইহাদের মনের গতি অতি চঞ্চল, ক্ষণে ক্ষণে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হয়! ইহারা বুদ্ধিতে ইতর জন্তুর তুল্য! ইহাদের দ্বারা জগতের মঙ্গল হইবে এমত আশা করা উচিত নয়। পৃথিবীতে যত অমঙ্গল ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে স্ত্রী-জাতিই প্রায় তাহার মূলকারণ। ইহারা নিজে অতি হীন-বুদ্ধি কিন্তু আপনাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে না। ইহাদের মনের দৃঢ়তা নাই, অল্প সুখেই আপনাদিগকে মহাসুখী জ্ঞান করে আবার সামান্য দুঃখেই অভিভূত হইয়া পড়ে। ইহাদের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিই অধিক বলবতী—ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধি অব্যবহার্য্য পদার্থের ন্যায় কলুষিত। হায়! স্ত্রীজাতি এমনি অস্থিরচিত্ত যে ইহারা কোন কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারে না। বিশ্বাস করিয়া কোন অপ্রকাশ্য কথা ইহাদিগকে বলিলে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলে। আপনারা স্বপ্নেও কখন পরের উপকার করিতে ইচ্ছা করেনা, কিন্তু পরের উপকার পাইবার আশা এত বলবতী যে অপরের নিকট উপকার পাইবার একটু ত্রুটি হইলে অমনি আত্মীয়

বন্ধুর নিন্দা আর তাহাদের মুখে ধরে না। ইহারা বিবাদ করিতে এত প্রিয়, যে সৌহার্দ্য রূপ অমৃতগুণ বিসর্জ্জন দিয়া কলহজাল বিস্তার করত কতশত গুণালঙ্কৃত পুরুষকে সেই জালে ফেলিয়া গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করে। ইহাদের গুণ, বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না—অধিকাংশ স্ত্রীলোক অর্থ এবং অলঙ্কারের নিমিত্ত স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে। স্বামী যদি অভিলষিত বস্তু প্রদানে অক্ষম হন তাহা হইলে অর্থগৃধ্নু স্ত্রী, ভর্ত্তার প্রতি কত কোপ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে! হায়! এরূপ স্ত্রীজাতি আবার স্বামিসুখে সুখিনী ও স্বামি-দুঃখে দুঃখিনী হইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা, তুমি যে কি মনে করিয়া এরূপ কথা বলিলে তাহা বলিতে পারি না"।

সুবুদ্ধি মনোহর মনোরঞ্জনের এইরূপ স্ত্রী জাতির প্রতি অনাস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন—"সখে! স্ত্রীজাতির প্রতি এত দোষারোপ কি জন্য করিতেছ? ইহারা তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? জগৎপিতা জগদীশ্বর জগতের অমঙ্গলের নিমিত্ত কি একটা প্রধান জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন? পৃথিবীর হিতের জন্যই করুণাময় পরমেশ্বর স্ত্রীজাতিকে কোমলপ্রকৃতি ও সাহসহীন করিয়াছেন, তবে তুমি স্ত্রীলোকের যে অশেষ দোষ কীর্ত্তন করিলে সে সকল দোষ কেবল দেশাচারদোষে ও পুরুষদের শিক্ষাদোষেই হইয়াছে। স্ত্রীজাতি দ্বারা জগতের উপকার হয় না

একথা তোমায় কে বলিল? ইহাদিগকে উত্তম রূপে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে এবং সদুপদেশ প্রদান করিলে বুঝিতে পারিবে যে স্ত্রীজাতি দ্বারা জগতের উপকার হইতে পারে কি না। স্ত্রীলোকদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদের প্রতি তোমার দয়ার সঞ্চার না হইয়া তদ্বিপরীত কোপের উদ্রেক হইল? হায়! অস্মদ্দেশীয় অবলা-কুলের দুরবস্থা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, যদি কাহারো একটী কন্যা-সন্তান হয় তাহা হইলে প্রসূতি বিবেচনা করেন "আমার দশ মাস দশ দিন অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়া গর্ভধারণ করা নিরর্থক হইল! অপরাপর বন্ধুবান্ধবের অসন্তোষের আর সীমা রহিল না, অধিক কি বলিব স্নেহময়ী জননী কন্যাকে প্রকৃতরূপে লালনপালন করেন না; তবে করুণাময় জগৎপিতা মায়ের মনে, অপত্যস্নেহ দিয়াছেন বলিয়াই অসহায়া নববালা রক্ষিত হয়, নতুবা সূতিকাগারেই ভারতরমণীগণের চিরদুঃখের শেষ হইত।

দেখ বন্ধো! লোক পুত্রের স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত কত যত্ন করিতেছেন—বিহিত বিধানে পুত্রকে লালন পালন ও শিক্ষাদান করিয়া মনুষ্যসমাজের যোগ্যপাত্র করিতেছেন এবং সেই কৃতী পুত্রকে আপন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু কন্যার হিতকর কোন কার্য্যই করেন না—বাল্যক্রীড়ায় তাহাদের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়, এসময়ে তাহারা কিছুমাত্র শিক্ষা বা উপদেশ প্রাপ্ত হয় না। তাহাদের বিবাহ দিয়া শ্বশুরালয়ে

পাঠাইতে পারিলেই পিতা মাতা "কন্যাদায় হইতে মুক্ত হন"। যত দিন কন্যা অবিবাহিতা থাকে ততদিন পিতা মাতা আপনাদিগকে "কন্যাভারাক্রান্ত" বিবেচনা করেন, যেমনতেমন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলেই আপনাদিগকে সেই ভার হইতে মুক্ত বিবেচনা করেন। পাত্রের গুণাগুণ বিবেচনা করা যে পিতার অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা একবারও মনে করেন না। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাইয়াও শিক্ষা বা সদুপদেশ প্রাপ্ত না হইয়া কেবল বৃথা ভয় ও লজ্জা শিক্ষা করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চাতুরী ও প্রবঞ্চনা করিতে শিক্ষা পায়। ইহারা নূতন বিষয় কিছুই শিখিতে পায় না। কেবল অন্যের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া জীবন অতিবাহিত করে। দেখ ভাই! যখন আমাদের স্ত্রী-সমাজের এত দুর্দ্দশা তখন যাঁহারা সেই দুর্দ্দশাপন্ন স্ত্রীলোকের স্বামী হন তাঁহাদের এবিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। স্ত্রীর দুর্দ্দশামোচনে উদ্যোগী স্বামী অতি বিরল, স্বামী প্রায়ই স্ত্রীকে "ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির বস্তু মনে করেন," সুতরাং জন্মাবচ্ছিন্নে তাহারা কখন সৎশিক্ষা পায় না, কেবল কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সংসার নির্ব্বাহ করে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দিনদিন কলুষিত হইয়া যায়। স্ত্রীজাতির দোষ কি? যা কিছু দোষ দেশাচারের; আবার দুঃখের বিষয় দেখ দেখি মধ্যে স্ত্রীলোকদের লেখা পড়ার নাম মাত্র ছিল না বরং অনেকেই তাহার বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদে স্ত্রী-বিদ্যালোচনার আর তাদৃশ প্রতিবন্ধকতা নাই

বিদেশী রাজপুরুষদের প্রসাদে এখন আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা একপ্রকার প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ বিদ্যা এপর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোকেই শিখেন নাই। স্ত্রীবিদ্যা-বৃক্ষে অমৃতময় ফল উৎপন্ন না হইয়া বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে!! অনেক নব্যবাবুরা স্ত্রী ও কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেছেন বটে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা এপর্য্যন্ত কেহই দেন নাই"।

বন্ধুদ্বয়ে এবম্বিধ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন এমন সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া কহিল "কর্ত্তামহাশয় মনোহর বাবুকে কি জন্য ডাকিতেছেন"। ভৃত্যের কথা শুনিয়া দুই জনে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, কিয়দ্দূর গিয়া মনোরঞ্জন বলিলেন "না—তুমিই যাও আমার যাওয়া উচিত নয়, কারণ বাবা আমায় তো ডাকেন নাই তোমাকেই ডাকিয়াছেন।" এই বলিয়া মনোরঞ্জন পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন—স্ত্রীজাতিবিষয়ক নানা প্রকার চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দলিত হইতে লাগিল।

এদিকে হরিনাথ মনোহরকে দেখিতে পাইয়া নিকটে ডাকিলেন এবং বলিলেন—" বৎস মনোহর! আমি তোমায় কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া ডাকিলাম, তুমি মনোরঞ্জনের চির-সুহৃদ্—বাল্যকালাবধি তোমাদের যেরূপ সদ্ভাব তাহাতে মনোরঞ্জনের প্রকৃতিবিষয়ে তোমার কিছুই অবিদিত নাই। অতএব এখন আমি এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তুমি উহার মনের গতি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ কি? মনোহর! বলিতে কি উহাকে দেখিয়া আমার আর এক

তিলার্দ্ধ সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই। মনোরঞ্জন এক্ষণে সর্ব্বদাই উদাসীনের ন্যায় বেড়াইতেছে কেন, কিছু বলিতে পার? উহার মুখকান্তি দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে, সর্ব্বদাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কি চিন্তা করিতেছে, দেখ কল্য আমি উহাকে ডাকিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া নিকটে ডাকিলাম কিন্তু উহার মুখভঙ্গী দেখিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তাহার পর দেখিলাম সে আমার নিকট হইতে উঠিয়া বাগানের দিকে গেল। আমি অতি গোপনে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম এবং দেখিলাম যে মনোরঞ্জন পুরাতন আম্রবৃক্ষের তলায় গিয়া কোটর হইতে একটা কৌটা বাহির করিল এবং কৌটাটি হাতে করিয়া প্রথমে কতক্ষণ অশ্রুপাত করিল। মনোহর! মনোরঞ্জনের সেই সময়ের অবস্থা মনে করিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, বৎস! আর আমি বলিতে পারিতেছি না। হা বিধাত! এই মাতৃপিতৃবৎসল কুমার এমন দুরবস্থাপন্ন হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। মনোহর! তাহার পর কৌটাটি খুলিয়া কি বাহির করিল স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর দেখিলাম যে সে আপন গাত্রবস্ত্র হইতে কি গন্ধদ্রব্য বাহির করিয়া ঐ কৌটাস্থিত পদার্থে লেপন করিল, তৎপরে কৌটা সম্মুখে স্থাপন করিয়া জানু পাতিয়া ঊর্দ্ধে শির উন্নত করিয়া একান্ত মনে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিল। তাহার পর কৌটাটি হস্তে লইয়া একবার শিরে এবং একবার বক্ষে ধারণ করিয়া "হা মাতঃ! হা মাতঃ! এই"

কথাটি বারম্বার উচ্চারণ করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কি বিড়ম্বনা—মনোরঞ্জন এইপ্রকার কতকক্ষণ বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার কৌটাটি বক্ষে তুলিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। আমি এই অবসরে ঐ কৌটা খুলিয়া দেখিলাম সুগন্ধ পুষ্প চন্দনে আচ্ছাদিত কতকগুলি অস্থি রহিয়াছে। কি অভিপ্রায়ে যে অস্থিগুলি এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছে কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ইহার কারণ কিছু বলিতে পার ? ”

মনোহর বলিলেন—“মহাশয়! ও কোন দুষ্টাভিসন্ধিতে সে অস্থিগুলি রাখে নাই, মাতৃবিয়োগকষ্ট উাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই জন্য মাতার অস্থিগুলি লইয়া প্রত্যহ মাতৃ-উদ্দেশে পূজা করে এবং মাতাকে স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করে। আমি সকলই জানি এবং কখন কখন উহার সঙ্গে ঐ উদ্যানে যাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু উহার ইচ্ছা নয় যে আমি সঙ্গে যাই অথচ স্পষ্ট করিয়া নিবারণ করে না, সুতরাং আমিও সঙ্গে যাইতে নিবৃত্ত হই না। মনোরঞ্জন অনেক বার আমাকে বলিয়াছে “আমি মাতৃদেবীর অস্থি রাখিবার নিমিত্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিব”। ব্রাহ্মণের মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে মনোরঞ্জন উম্মত্ত হইয়াছে, মনোহরের কথা শুনিয়া সে ভ্রম দূর হইল।

তৎপরে ব্রাহ্মণ কহিলেন—“দেখ বৎস! আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে শীঘ্র একটী উত্তম দিন স্থির করিয়া বধূমাতাকে এখানে আনিব, ইহাতে তোমার মত কি ?—বি-

শেষতঃ বালিকাটিও পিতৃমাতৃহীন, অতএব আর সেখানে রাখা উচিত নয়। যতদিন জীবিত থাকি আপন গৃহে আনিয়া লালন পালন করি।

মনোহর জানিতেন না যে মনোরমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে সুতরাং তিনি হঠাৎ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন—বলিলেন "সে কি মহাশয়! মনোরঞ্জনের শাশুড়ীরও কি মৃত্যু হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "হাঁ বৎস! তিনি আপন কন্যার বিবাহের কিয়দ্দিবস পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। আহা! তাঁহার মত সাধুশীলা পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার এক একটা গুণ স্মরণ হইলে শরীরে লোমাঞ্চ হয়। পতিবিয়োগ হইলে যেরূপে তিনি কালাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইবে। স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ থাকা উচিত তৎসমুদয়ই তাঁহাতে ছিল। তাদৃশ স্ত্রীরত্ন আমি কুত্রাপি দেখি নাই। মনোহর ব্রাহ্মণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন "মহাশয়! তিনিই মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গুণ আরো প্রকাশিত হইতেছে, সকলেই একবাক্য হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন।"

মনোহরের এই সমস্ত কথা শুনিয়া হরিনাথ বলিলেন; "বৎস! ব্রাহ্মণ স্ত্রীর গুণে একান্ত বাধ্য হইয়া ছিলেন এজন্য পূর্ব্বে অনেকে স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহার

প্রতি দোষারোপ করিত,কিন্তু তাঁহাদের মনে সে ভ্রম অধিক দিন স্থান পায় নাই, কারণ ব্রাহ্মণীর অলৌকিক গুণ-সমূহ অবিলম্বে প্রকাশ হইল এবং তদনুসারে তাঁহাকে একটি অসামান্য স্ত্রীরত্ন বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং দুর্গাচরণকে সতী-সংসর্গ-ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া ভক্তি করিতে লাগিলেন। বৎস! সদ্গুণ কখনই লুক্কায়িত থাকে না সময়ে সকলই প্রকাশ পায়। সূর্য্যদেবকে কি কেহ কখন হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিতে পারে? চন্দ্রমাকে কি চন্দ্রাতপে আবৃত করিতে পারে? সাধুপুরুষের গুণ কদাচ অপ্রকাশিত থাকে না। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে বধূমাতা যেন মাতৃগুণের অধিকারিণী হয়েন।" কথায় কথায় প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, মনোহর ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

হরিনাথ আর কাল বিলম্ব না করিয়া পুত্রবধূকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। মনোরমা পতিগৃহে আসিয়া সকলই বিপরীত ও বিশৃঙ্খল দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; কিন্তু কি করেন, আপনারই বা সাধ্য কি যে তাঁহাদের ক্লেশ দূর করেন, কিন্তু তথাচ ক্ষান্ত না হইয়া প্রাণপণে তাঁহাদের ক্লেশ দূর করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতৃতুল্য ভক্তি-সহকারে শ্বশুরের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্রবধূর ব্যবহারে ব্রাহ্মণ অতীব সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রবধূর অলৌকিক রূপমাধুরী ও অসামান্য গুণ দর্শন করিয়া পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তি অপার আনন্দনীরে মগ্ন না হন?

এদিকে মনোরঞ্জন স্ত্রীর এপর্য্যন্ত একটি বর্ণমাত্র শিক্ষা হয় নাই দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কি উপায়ে পত্নীকে লেখা পড়া শিখাইবেন সর্ব্বদাই সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোককে লেখা পড়া শিখান কঠিন ব্যাপার বলিয়া ও ভাবিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল যে অল্প শিক্ষিত, অথচ অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকের দ্বারা জগতের যত অমঙ্গল হইতে পারে অশিক্ষিত স্ত্রী লোকের দ্বারা তত অমঙ্গল হয় না। অশিক্ষিতা স্ত্রী কেবল আপনার অমঙ্গল করে কিন্তু অল্প শিক্ষিতা অথচ অসচ্চরিত্রা স্ত্রী আপনার অমঙ্গল করিয়া ক্ষান্ত হয় না, যতদূর সাধ্য পরের অনিষ্ট সাধন করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয় এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে নিন্দাভাজন করে। অতএব এমন শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা মূর্খ ও অজ্ঞান রাখা শত গুণে শ্রেয়ঃ। অতএব কি করি ?— অজ্ঞান স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া বিন্দু মাত্র সুখের আশা নাই। যাহা হউক সাধ্যানুসারে লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। কেমন করিয়া লেখা পড়া শিখাইলে যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে এবং ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করিবে এই বিষয় কতক ক্ষণ অনন্যমনে চিন্তা করিয়া অবশেষে মনে মনে স্থির করিলেন যত দিন না মনোরমা উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তত দিন আমি উহার সহিত অন্য আলাপ করিব না। এক্ষণে উভয়ে বিদ্যা ও জ্ঞানোপার্জ্জনে তৎপর হই, পশ্চাৎ জীবিত থাকি সদালাপ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া উভয়ে পবিত্র-প্রণয়-সুখানুভব করিব। মনে মনে এইরূপ

স্থির করিয়া স্ত্রীকে বিদ্যা শিক্ষা ও তৎসঙ্গে জ্ঞানোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

মনোরমা পতির আজ্ঞানুসারে প্রথম ভাগ আরম্ভ করিলেন, এবং একাগ্রচিত্তে পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। পতি যে সকল নীতিগর্ভ হিতকর উপদেশ দিতেন তাহা তিনি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করিতেন ও তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেন, এবং যে কোন কথা হউক না কেন অসন্দিগ্ধচিত্তে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতেন। এইরূপে তাঁহাদের মনে যে প্রণয়-বৃক্ষ রোপিত হইল দিন দিন তাহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনোরমা স্বভাবতঃ সত্যবাদিনী এবং ধর্ম্মভীতা ছিলেন তাহাতে আবার স্বামীর সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন অলৌকিক গুণ সমূহে ভূষিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার কোমল স্বভাবের কথা কি বলিব তাঁহার দয়াদ্র´চিত্ত পর দুঃখে দ্রব হইয়া যাইত। যখন তিনি বালিকা ছিলেন তখন যদি দৈবাৎ কোন শোকাতুর স্ত্রীলোকের রোদন শুনিতে পাইতেন অমনি তাহার নিকটে গিয়া প্রবোধ দিতেন এবং সান্ত্বনা করিতে গিয়া স্বয়ং তাঁহার দুঃখে আভিভূত হইয়া পড়িতেন এবং অজস্র অশ্রুপাত করিতেন। কখন যদি ক্ষুধাতুর মনুষ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইত তাহা হইলে তিনি আপন আহার সামগ্রী দিয়াও ক্ষুধিত ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। শান্তস্বভাব প্রযুক্ত রুক্ষকথা কহিয়া কখন কাহার মনে কষ্ট দিতেন না। অধিক কি বলিব তাঁহার হৃদয় সমুদয় সদ্গুণে সুশোভিত ছিল। তাঁহার নম্র ও প্রফুল্ল

মুখ দেখিলেই তাঁহাকে সকল গুণের আকর বলিয়া বোধ হইত। তিনি সমস্ত দিন গৃহকর্ম্ম করিতেন, অবকাশ পাইলেই একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিতেন। দিবাভাগে প্রায় সময় পাইতেন না, এজন্য রাত্রিতে না ঘুমাইয়া অধ্যয়ন করিতেন; এইরূপে তিনি বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখিলেন। তাহা দেখিয়া মনোরঞ্জন তাঁহাকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, অনন্তর কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ নিয়মানুসারে শিক্ষা দিয়া যত কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন ততই মনোরঞ্জনের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে স্ত্রীকে সুশিক্ষিত করিয়াও তাঁহার মনের তৃপ্তি হইল না, তিনি দেখিলেন মনোরমার স্বভাব অতি কোমল সুতরাং এ প্রকার মন হইতে এ জগতে হঠাৎ বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! তোমায় আরো কতকগুলি কথা বলিব মনে করিয়াছি কিন্তু বলিবার উপযুক্ত সময় পাই নাই, কিম্বা বলিবার প্রয়োজন দেখি নাই; তথাপি বলি শোন—দেখ—প্রিয়ে! অনেক স্ত্রী সামান্য সুখ্যাতি লাভের আশয়ে কতই কপটতা প্রকাশ করে, কিন্তু তুমি কদাচ তাহা করিবে না বোধ হইতেছে; যথার্থ পতিব্রতার সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সমাধা করিবে। এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন মত, সুতরাং এক ব্যক্তির অভীষ্ট কর্ম্ম করিতে গিয়া অপর ব্যক্তির অপ্রিয় করা হয়। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়া কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হয় সেই পরম পিতার প্রিয় সন্তান মধ্যে পরিগণিত হইয়া

থাকে, তাদৃশ ব্যক্তিকে " অপকর্ম্ম করিলাম " বলিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয় না। প্রিয়ে! সর্ব্বদা সত্যপথে থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারিলে যে অতুল আনন্দ-রসামৃত পান করিতে পারা যায় সে সুখের সহিত তুলনা করিলে এই সংসারের ক্ষণিক সুখ সুখ বলিয়াই বোধ হয় না। সর্ব্বদা জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া কর্ম্ম করিলে পাপ-প্রবৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া যায়। মনুষ্যের অভিলষিত সাধন করিতে গিয়া সেই করুণাময় জগৎপিতা জগদীশ্বরের পবিত্র আজ্ঞার কিছুমাত্র অতিক্রম করিও না। এইরূপ নিয়মে কর্ম্ম করিলে সংসারের কপটজালে পতিত হইতে হয় না। দেখ আমাদের দেশে আধুনিক স্ত্রীলোকদিগের পতিপরায়ণতা দেখিলে হাঁসি পায়। পতিব্রতা যে কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না, অথচ এই পবিত্র উপাধির অধিকারিণী হইতে সাহসী হয়। পতিব্রতা হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়; অনেক স্ত্রীলোক আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত স্বামীর প্রিয় কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু স্বামী ইষ্ট সিদ্ধি করিতে না পারিলে আর তাঁহাকে তাদৃশ পূজা করেনা। অনেক স্ত্রীলোক পতির প্রসাদ ও চরণামৃত খাইয়া এবং চরণ পূজা করিয়া পতিব্রতা হয়েন, কিন্তু যত পারেন স্বামীকে ফাঁকি দিতে ক্রটি করেন না, স্বামীর অজ্ঞাতসারে কতই কুকর্ম্ম করেন। এই প্রকার পতিব্রতাই অনেক দেখিতে পাই, কিন্তু প্রকৃত পতিব্রতা হইতে হইলে যে সকল কাজ করিতে হয় তাহা কেবল যথার্থ পতিব্রতারাই জানেন।"

মনোরমা বলিলেন " নাথ! তুমি পতিব্রতার যথার্থ ধর্ম্ম বলিতেছ না কেন? আমি এই কথাটি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি"। এইরূপ বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তাহাতে মনোরঞ্জন বলিলেন " প্রিয়ে! আমি মনে করিয়াছিলাম আমার মনোরমাকে সকল বিষয় বলিব কেবল পতিসংক্রান্ত কোন কথা বলিব না, কিন্তু যে প্রকার অনুরোধ করিতেছ তাহাতে না বলিয়াই বা কি করিয়া ক্ষান্ত হই। কিন্তু বিস্তার করিয়া বলিবার সময় নাই, প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত, বেড়াইতে যাইবার জন্য এখনি মনোহর আসিবে। তবে কিছু বলি শুন; "যিনি যথার্থ পতিব্রতা তিনি পতির সুখে সুখী ও পতির দুঃখে দুঃখী হয়েন ও নিজের সুখ দুঃখ বিস্মৃত হন; পতি দুঃখই দিন আর সুখই দিন, পতির প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভক্তির কদাচ হ্রাস হয় না; পতিব্রতারা পতির সন্তোষের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন। স্বামী যথোচিত আদর না করিলেও যিনি স্বামীকে দেবতুল্য পূজা করেন এবং স্বামী ক্লেশ দিলেও যিনি অসন্তুষ্ট না হইয়া স্বামীর সহবাস স্বর্গবাস অপেক্ষাও অধিক সুখকর জ্ঞান করেন, পতির মনোরঞ্জন করাই যাঁহার একমাত্র ব্রত তিনিই যথার্থ পতিব্রতা।"

মনোরমা এই সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, " সীতাদেবী যথার্থ পতিব্রতা; আহা! তিনি স্বামীর জন্য সমস্ত কষ্টই অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন; ফলতঃ তাঁহার তুল্য পতিব্রতা আর নাই।" মনোরঞ্জন স্ত্রীর এই কথা শুনিয়া ঈষৎ

হাসিয়া বলিলেন প্রিয়ে! যদি সীতাদেবীকে পতিব্রতা বলিতেছ তবে গুণধাম রামচন্দ্রকে পত্নীব্রত কেন না বলিতেছ? আহা! তিনি সীতার জন্য কি না করিয়াছিলেন,তিনি তিলার্দ্ধ কাল সীতাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। তাঁহার সীতাগত প্রাণ ছিল এবং সীতাই তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব ছিলেন। তবে যদি বল যে রামচন্দ্র সীতাকে কি জন্য বনবাস দিয়াছলেন? তিনি প্রাণাধিকা সীতাকে জগদ্বিখ্যাতা করিবার জন্যই বনবাস দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেবনে পাঠাইয়া এবং আপন সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। অতএব কেবল সীতাকে ধন্যবাদ না দিয়া উভয়কেই ধন্যবাদ দাও এবং তাঁহাদের অকপট পবিত্র প্রণয়কে ধন্যবাদ দাও। এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় মনোহর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মনোরঞ্জনের সহিত উভয়ে বেড়াইতে গেলেন। দুই বন্ধুতে মাঠে বেড়াইতেছেন এমন সময়ে নবগোপাল তর্কবাগীশ তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কি হে! অনেক দিন যে দেখি নাই! ভাগ্যে এইদিকে আসিয়াছিলাম তাই ত সাক্ষাৎ হইল। কেমন সব মঙ্গল ত? হাঁ মহাশয়! আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনার চরণ দর্শন পাই নাই। অদ্য কি সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইলাম; মহাশয়কে প্রণাম করি। জয়োঽস্তু, ওহে! এখন আর আমাদের দর্শনে তোমাদের ফল নাই, তোমাদের দর্শনেই আমাদের নয়ন সার্থক হইবে। কল্য ব্রাহ্মণীর

নিকট যে সকল কথা শুনিলাম তাহা কত দূর সত্য জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছি। তুমি নাকি নাত বৌয়ের অধ্যাপক হইয়াছ? কেমন হে! গুরুভক্তি কেমন? অগ্রে গুরুভক্তি শিক্ষা দিতেছ ত? আমরা কোন শিক্ষাও দিই নাই সুতরাং ভক্তিও পাই নাই। কল্য ব্রাহ্মণী আমার চরণসেবা না করিয়াই নিদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু ভাই! সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমার এক বারও নিদ্রা হয় নাই। সেই জন্য অদ্য প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণীকে বলিলাম, বলি তুমি আজিও পতিসেবা শিখিলে না! কিসে উদ্ধার হইবে? ব্রাহ্মণী আমার কথা শুনিয়া বলিল, আমাদের কিসে উদ্ধার হইবে, আমাদিগকে ত কেহ নীতিশিক্ষা দেয় নাই যে ভাল মন্দ জ্ঞান হইবে। আমরা ত জন্মান্ধ, আমাদিগের ত কেহ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেয় নাই। শুনিতেছি মনোরঞ্জন আপন স্ত্রীকে কেবল বিদ্যাভ্যাস করাইতেছেন এবং নীতিগর্ভ উপদেশ দিতেছেন; তিনি স্ত্রীর রূপযৌবনে বিমোহিত না হইয়া পত্নীর হৃদয়রাজ্য কেবল সদ্‌গুণে সুশোভিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দেখ দেখি মনোরঞ্জনের বাল্য কালেই কেমন জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়াছে। স্ত্রীলোককে স্বামী বিদ্যাভ্যাস না করাইলে কে আর লেখা পড়া শিখাইবে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের ত আর স্কুলে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিবার উপায় নাই এবং অন্য কেহই শিক্ষা দেয় না সুতরাং স্বামীরই শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে তোমার গৃহে আসিয়াছি, এক্ষণে পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃ-

ক্রম হইল, এই দীর্ঘকাল তোমার সহবাসে আছি কিন্তু এক দিনও সদুপদেশ প্রাপ্ত হই নাই। কেবল আপন ইষ্ট-সিদ্ধির ঘূণাক্ষরে ত্রুটি হইলেই কুপিত হও! কিন্তু আমার কি ইষ্টচিন্তা করিতেছ? যৌবনসুখে মত্ত ছিলে এখন বৃদ্ধকালে আবার ধনতৃষ্ণার বৃদ্ধি হইয়াছে। চিরকাল কেবল তোমার দাসীবৃত্তিই করিতেছি। জ্ঞান শিক্ষা দিয়া এবং বেদ ও পুরাণ অধ্যয়ন করাইয়া অপর লোকের মনো-মালিন্য দূর করিতেছ! কিন্তু যাহাকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া গৃহে আনয়ন করিয়াছ তাহার কি করিতেছ? যদি কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা জিজ্ঞাসা করি অমনি বল এখন থাক এসব কথা পরে হইবে। যদি চারি দণ্ড ইষ্ট দেবের পূজা করি অমনি বলিতে থাক এত ভণ্ডামি কোথায় শিখিলে? জন্মের মধ্যে পিতৃ-গৃহে পাঠাইলে না সুতরাং পিতামাতার সেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিলাম না। তোমার নিকটেই শুনিয়াছি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" আমি মূর্খ অজ্ঞান স্ত্রীজাতি, আমার সে সকল কথা ভাল উচ্চারণ হয় না। তবে তুমি অর্থ বলিয়াছিলে যে গর্ভধারিণী ও জন্মভূমি সকলের অপেক্ষা পূজনীয়। অতএব এসকল জানিয়াও যে তুমি আমাকে জননী ও জন্মভূমি দর্শনে বঞ্চিত করিলে এসকল কি সামান্য দুঃখের বিষয়! এইরূপ ব্রাহ্মণীর যা মুখে আসিল তাই বলিল ও কত যে ভৎর্সনা করিল তাহা আর কি বলিব। আমি ব্রাহ্মণীর কথায় হতবুদ্ধি হইয়াছি। সেই অবধি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার

নিমিত্ত অতীব ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ খুজিতেছি। ভাই! আমরা অনেক পুরাণাদি অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীকে যে আবার লেখা পড়া শিখাইতে ও উপদেশ দিতে হয় তাহা কোন শাস্ত্রেই দেখিতে পাই না। স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করিতে হয় এবং যাহাতে কোন দুষ্ক্রিয়াসক্ত না হয় এরূপ শাসনে রাখিতে হয়। কিন্তু তোমাদের এখন সকলি নূতন হইয়াছে। যাহা হউক, কেমন করিয়া স্ত্রীশিক্ষা দিতে হয় তোমার নিকট শিক্ষা করিব। মনোরঞ্জন ব্রাহ্মণের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণীকে সাধুশীলা বলিয়া ভক্তি জন্মিল, পরে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। মহাশয় কি আমায় ব্যঙ্গ করিতেছেন? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং বয়সে প্রাচীন ও বহুদর্শী, যাবতীয় গুণ আপনাতে সম্ভবে, আপনি আবার আমার নিকট কি শ্রবণ করিবেন? আপনারা বিবাহকালীন যে সকল মন্ত্র পাঠ করেন তাহাতেই যে স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আপনাদের শাস্ত্রে নাই এরূপ কথা কেন বলিতেছেন? আপনাদের শাস্ত্রেইত স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য লেখা আছে। স্বামী শব্দের অর্থ যিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন তিনিই জানেন যে স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। সহধর্ম্মিণী শব্দের অর্থ যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই জানেন যে স্ত্রীর ধর্ম্মের প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখিতে হয়। আপনারত কিছুই অবিদিত নাই; আপনি আবার আমায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ঐ যে মহাশয়

দুইটি স্থূল কথা বলিলেন " ভরণ পোষণ করিতে হয় এবং শাসনে রাখিতে হয় " এই দুই কথার মধ্যে সকলই রহিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়সুখদ পদার্থদান ও সুবর্ণে মণ্ডিত করিলেই যে সম্যক্ সুখী করা হয় এবং পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেই যে রক্ষা করা হয় এমন বিবেচনা করা কেবল ভ্রম মাত্র। ব্রাহ্মণ মনোরঞ্জনের কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন ওহে! তবে কি রকম করিয়া ভরণ পোষণ করিতে হয় এবং কি প্রকারেই বা রক্ষা করিতে হয় বল শ্রবণ করি।

রীতিমত শিক্ষাদান দ্বারা স্ত্রীর বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও কুসংস্কার সকল দূরীকৃত করিয়া পরমেশ্বরের নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবার জন্য সদুপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে সেই সমুদয় নিয়ম প্রতিপালনে তাঁহার যত্ন ও অনুরাগ জন্মে এবং করুণানিধান জগৎপাতার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয় তদনুসারে শিক্ষা দেওয়া স্বামীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ শিক্ষা দিলে আর পিঞ্জরে বদ্ধা করিয়া রক্ষা করিতে হয় না। তখন সহজেই সেই সুশিক্ষিতা স্ত্রীর পতিগত প্রাণ হয় এবং প্রাণান্তেও পতির অপ্রিয়াচরণে অভিলাষিণী হয় না, সুতরাং স্বামীর অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম্মই করে না; সতত স্বামীর প্রিয় কর্ম্ম করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পায়, যদি দৈবাৎ কোন অপ্রিয়ানুষ্ঠান হইয়া যায় তাহা হইলে সেই পতিপ্রাণা স্ত্রীর অন্তঃকরণ গতানুশোচনায় দগ্ধ হয় এবং পতির নিকট আপন দোষ

স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। সম্প্রতি মহাশয়দের মতে স্ত্রীকে যেরূপে রক্ষা করিতে হয় তাহাতে উপকার হওয়া দূরে থাকুক অনেক স্থলে অপকারই হইয়া থাকে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি কতশত গৃহস্থের গৃহিনীরা কর্ত্তা বাটীতে নাই বলিয়া সুযোগ পাইলেই কর্ত্তার অনভিমত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। তবে আর তাহাদের কর্ত্তার কথায় শ্রদ্ধা কোথায়? কেবল ভয়ে মতানুসারে কর্ম্ম করে অনুপস্থিত কিম্বা অন্য প্রকার সুযোগ পাইলেই স্বামীর অনভিমত আপনাদের কুপ্রবৃত্তির অভিমত কর্ম্ম করিয়া থাকে। হায়! ঐরূপ চিরপরাধীনতা হইতে যদি দৈবাৎ কোন প্রকারে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় যত চিরাভিলষিত এক কালে সাধন করে। অস্মদ্দেশীয় পতিপুত্রবিহীনা অঙ্গনারা এ বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। তাহারা লোক-লজ্জা ধর্ম্মভয় এক কালে পরিত্যাগ করিয়া কুপ্রবৃত্তি-পথে পদার্পণ করে। যদি অশিক্ষিতা সধবা স্ত্রীরা একটু কর্ত্তৃত্ব পান তাহা হইলে আর তাঁহারা গর্ব্বে ভূতলে পদার্পণ করেন না। সকলকেই আপন পদানত জ্ঞান করেন। আপনার অপেক্ষা অপরাপর স্ত্রীদিগকে পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ দেখিয়া আপনাকে রাজেশ্বরী কি জগদীশ্বরী জ্ঞান করত সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন। আপনি কি জানেন না ব্রজেন্দ্র দাদার স্ত্রী ত তাহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। অসামান্য গুণবিশিষ্ট যোগেন্দ্র দাদাকে সমস্ত গুণের আধার বলিলেও বলা যায়। তাঁহার যাবতীয় গুণ আমি এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারি না। ফলতঃ তাঁহার সদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ

আমি কম দেখিয়াছি। আহা! দাদাকে দয়ার সাগর বলিলেও বলা যায়। দেখুন দেখি! দাদা কত বড় বৃহৎ পরিবারটির একমাত্র আশ্রয় হইয়া পালন করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীটি সকল বিষয়েই তদ্বিপরীত হইয়াছেন। তাঁহার কথা শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি সকলের নিকট আপন প্রভুত্ব জানাইতেছেন এবং সকলকেই আপন অধীন জ্ঞান করিয়া অশ্রদ্ধা করিতেছেন। এখন তাঁহার অহঙ্কার ও প্রভুত্ব দেখিয়া দাদার অন্নে প্রতিপালিত তাবৎ মনুষ্য একবাক্য হইয়া বলিতেছেন যে আমরা বরং ভিক্ষান্ন দ্বারা উদর পূরণ করিব তথাপি এ রাক্ষসীর অধীনে থাকিব না। যদি দাদা আপন ভার্য্যাকে উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা দিতেন এবং সদুপদেশ দিয়া আপন মতানুযায়ী করিতেন তাহা হইলে এই বিষম ব্যাপার ঘটিত না। আমার বোধ হয় দাদা স্ত্রীর এই দোষ জ্ঞাত নহেন; অজ্ঞাত না থাকিলে কদাচ এমন হইত না। আমাদের দাম্পত্যভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে পুরুষ যাবৎ বিবাহ না করেন তাবৎ তিনি স্বাধীন থাকেন, কিন্তু বিবাহ করিলেই ভার্য্যা অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী বলিয়া বর্ণিত হন—অর্থাৎ স্ত্রী পতির যাবতীয় সুখ দুঃখের অংশী ও পাপ পুণ্যের ভাগী হন। এমন স্ত্রীর চরিত্র সংশোধন করা পতির অবশ্য কর্ত্তব্য।”

বৃদ্ধ মনোরঞ্জনের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া

ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—“ওহে ভাই! তুমি আমার নিকট যোগেন্দ্রবাবুর কি গুণ কীর্ত্তন করিতেছ! তাঁহাদের বাটীর কোন কথা আমার অবিদিত নাই। যোগেন্দ্রবাবুর সে সকল গুণ এখন স্বপ্নবৎ হইয়াছে; এখন তাঁহার কথা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এখন যোগেন্দ্রবাবু হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। তিনি স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া বাহ্য জ্ঞান ও বিবেকশক্তিরহিত হইয়াছেন। এক্ষণে সকলেই স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতেছে। ওহে মনোরঞ্জন! তুমি এমন কথা কেন বলিলে যে যোগেন্দ্রবাবু স্ত্রীকে অশিক্ষিত রাখিয়াছেন। তিনিও পত্নীর বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত বিবি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আরও শুনিতেছি যোগেন্দ্রবাবুর ভার্য্যা বিলাতি পোশাক পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডীয় অঙ্গনাদের ন্যায় লজ্জা ত্যাগ করিয়া ঘোমটাতে জলাঞ্জলি দিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া দাস দাসী ও অপরাপর লোকের সহিত এমন ভাবে কথা কহেন যে দেখিলে বোধ হয় ইনি হয় খৃষ্টানী নতুবা মুসলমানী, হিন্দুরমণী বলিয়া কিছুমাত্র বোধ হয় না। যোগেন্দ্রবাবুও উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্ত্রীর উপরেই সমুদয় সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভারার্পণ করিয়াছেন; আপনি কোন বিষয়ের হিসাব পত্র দেখেন না। বৃদ্ধা জননী ত কিছুতেই নাই, কেবল অনবরত কায়িক পরিশ্রম করিতেছেন এবং কিসে পুত্রের মান সম্ভ্রম রক্ষা হইবে তাহারই চেষ্টা করেন। পুত্রবধূর এই

সমস্ত গর্হিত কর্ম্ম দেখিয়াও কিছু বলেন না, বরং তাঁহার দোষ লুকাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন, সুতরাং যোগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী স্বেচ্ছা মতে সমস্ত কার্য্যই করিতেছেন, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কর্ম্ম করেন না। পরশ্ব আমি কোন কার্য্য বশতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে যোগেন্দ্রবাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম; দেখিলাম বড় গিন্নী ম্লান বদনে আপন গৃহে বসিয়া আছেন। আমি বাটী প্রবেশ করিয়াই বড় গিন্নীকে ডাকিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না, পরে তাঁহার গৃহদ্বারে গিয়া ডাকিলাম। তিনি আমার স্বর বুঝিতে পারিয়া শশব্যস্তে এক খানি আসন লইয়া বাহির হইলেন এবং আমাকে বসিতে বলিয়া প্রণাম করিলেন। আমি তাঁহার মৌনভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় যোগেন্দ্রবাবুর মাতার দুঃখ-স্রোত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—“ঠাকুর পো! আমার আবার ম্লান হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হয়? যে দিন তোমার দাদা আমায় রাখিয়া কাশী গমন করিয়াছেন সেই দিনেই আমি দুঃখ-সাগরে পড়িয়াছি। আর ভাই! দেখিয়া শুনিয়া এক তিলার্দ্ধও যোগেন্দ্রর গৃহে থাকিতে অভিলাষ নাই। তিনি কেমন মায়াজাল কাটাইয়া পরম সুখে কাশীতে রহিয়াছেন। ‘অল্প দিনের জন্য যাইতেছি’ বলিয়া আমার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়া সকলি ভুলিয়া গিয়াছেন; শুনিতেছি আর গৃহে আসিবেন না। চরম কাল বিশ্বেশ্বরের চরণাশ্রয়েই অতিবাহিত করিবেন।

দুঃখের কথা কি বলিব বলিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কল্য বাজারের সময় বৌমার নিকট খরচের পয়সা চাহিলাম, না চাহিলে ত পাইবার উপায় নাই, আমার কি আর মান অপমানের ভয় আছে। আমি যদি অভিমান করিয়া এক মুহূর্ত্তও বাটীতে বসিয়া থাকি তাহা হইলে বাটীর কেহ তৃষ্ণার সময় জল পর্য্যন্ত পায় না, আমি তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলাম—"মা! বেলা অধিক হইয়াছে কখন বাজার যাইবে, অতএব শীঘ্র বাজার খরচের পয়সা দাও।" আমার কথা শুনিয়া বৌমা যেন জ্বলিয়া উঠিলেন এবং চারি আনার পয়সা দিয়া বলিলেন এই পয়সায় হয় ভাল নচেৎ আর অধিক পয়সা দিতে পারিব না। আমি বৌমার কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলাম। ভাই! যে সংসারে চারি টাকার বাজার খরচে হয় না সে সংসারে চারি আনায় কি হইবে? আমি বড় গিন্নীর এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলাম "বলি বড় বৌ! তুমিই ত বৌয়ের এই সমুদয় দোষের কারণ। তুমি বধূর এই সমুদয় দোষ গোপন রাখিয়াছ কেন? পুত্রের গোচর করিতে পার না? আর এ সংসারে কি সুখেই বা রহিয়াছ? পতির সঙ্গে কাশীবাসের যে কত ফল তাহা আমি এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারি না। শাস্ত্রে বলে—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে পরমপদ লাভ হয়।" তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু দুইটি কারণে আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। দেবেন্দ্র মহেন্দ্রই

প্রথম কারণ, উহারাই আমার পায়ের বেড়ী হইয়াছে। উহাদের একটা উপায় করিয়া না দিলে আর আমার কিছু-তেই আরাম নাই। হায়! এ হতভাগাদের যে আর আশ্রয় নাই—উহারা যে চিরদুঃখী—উহারা যোগেন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। বৌমায়ের যেরূপ ভাব দেখিতেছি তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে শীঘ্রই গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে"। এই সমুদয় বলিতে বলিতে তিনি অনিবার্য্য বেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনেক যত্নে উচ্ছলিত শোক সম্বরণ করিয়া বলিলেন-"ভাই! দেবেন মহেন যে আমার কিছুই জানে না—আমি উহাদিগকে ফেলিয়া কি প্রকারে স্থির মনে তীর্থ ভ্রমণ করিব? আর এক কারণ যোগেনের সন্তান দেখিয়া ইহ-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিব। এই দুই কারণে আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।" আহা! এমন গুণবান্ সন্তানের মাতা হইয়াও পুত্রবধূর দোষে সতত দগ্ধ হইতেছেন! বড় গিন্নীর ন্যায় সহিষ্ণু স্ত্রী আমি কুত্রাপি দেখি নাই। তাঁহার কি অলৌকিক গুণ,ভাই! এখনকার কালে ওরকম একটি স্ত্রীলোক দেখাও দেখি।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি মনোরঞ্জনের যে ঘৃণা ছিল তাহা নবীভূত হইয়া উঠিল; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"মহাশয়! আর স্ত্রীলোকদের গুণবর্ণন করিবার আবশ্যক নাই। স্ত্রীজাতির অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই; স্ত্রীজাতিকে কেন যে অবলা সরলা বলিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি না। তবে বোধ হয় স্ত্রী-

জাতি গোপনীয় কথা প্রকাশ করে এজন্যই সরলা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মূর্খ দুরাচার একশত পুরুষ হইতে জগতের যত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, দুর্ব্বৃত্ত কলহপ্রিয় একটি স্ত্রী হইতে তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গল হইতে পারে। অশেষগুণালঙ্কৃত একটি পুরুষ হইতে আবার জগতের যত হিত-সাধন হইতে পারে একশত সুশিক্ষিত ভদ্র রমণী হইতেও তাহা হইতে পারে না। একে ত স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সকল দোষের আকর তাহাতে আবার অশিক্ষিত হইলে তাহারা খলজন্তুতুল্য হইয়া উঠে। তাহাদের সদ্গুণসমূহ অব্যবহার্য্য হইয়া কলুষিত হইয়াছে, কিন্তু নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সর্ব্বদা ব্যবহার হওয়াতে তাহা দিন দিন প্রবল হইতেছে, সুতরাং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ বাত্যা বলবতী হইয়া এই সংসার-সাগরের পাপ-প্রবাহ প্রবল করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ এই সংসারার্ণবতরণের একমাত্র তরণীকে সাগরগর্ভসাৎ করিতেছে। একি সামান্য দুঃখের বিষয় যে অশেষগুণাকর যোগেন্দ্র দাদা স্ত্রীর দোষ গুণের বিচার করিতেছেন না। সেই জন্যই বলিতেছি যদি দাদা মহাশয় স্ত্রীকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিয়া পরে এতদ্রূপ কর্ত্তৃত্ব দিতেন তাহা হইলে কখনই এই মহা অনর্থকর ব্যাপার ঘটিত না। তিনি কি ইহাতে স্ত্রীর হিতসাধন করিতেছেন? ওপ্রকার স্বামীকে হিতাকাঙ্ক্ষী না বলিয়া শত্রু বলিলেও বলা যায়। সামান্য অর্থ ও অলঙ্কারাদি দিয়া স্ত্রীর ইন্দ্রিয়সুখ বৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু স্ত্রীকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করিয়া তাহার জ্ঞান মার্জ্জিত করা যে স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা ভ্রমেও মনে করেন

না। কিন্তু একদিন অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে। আপনি যে এইমাত্র বলিলেন বিবিদ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তা মহাশয়! আজ কাল ঐরূপ আড়ম্বরের সহিত অনেক ধনাঢ্য লোক স্ত্রী ভগনী পুত্রবধূ এবং কন্যা প্রভৃতিকে শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। স্ত্রীশিক্ষা ত আমাদের দেশে আর অপ্রচলিত নাই। এখন নব্য বাবুরা একটু মনোযোগ পূর্ব্বক যদি আপনাপন পরিবারবর্গকে সুনিয়মে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দেন তাহা হইলে দেশের কতক হিত সাধন হয়, কিন্তু সে রকম শিক্ষা কেহই দিতেছেন না। হায়! এই হতভাগিনী বঙ্গরমণীদিগের দুর্দ্দশা কখনই বা দূর হইবে! স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য এই কথাটি আজ কাল অনেকেরই মুখাগ্রে রহিয়াছে কিন্তু কাজে কিছুমাত্র দেখিতে পাইতেছি না। কতিপয় সদাশয় মহাত্মা এই শুভকর্ম্মে লিপ্ত আছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের দ্বারাই বা কতদূর উন্নতি হইতে পারে। স্বদেশের উন্নতি করা দূরে থাকুক যদি সকল কৃতবিদ্য সভ্য মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় পরিবারের উন্নতি চেষ্টা করিতেন তাহা হইলেও অনেক উপকার হইত, সকলেই যদি স্ব স্ব পরিবারকে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দিতেন তাহা হইলেও যথেষ্ট উপকার হইত, এমন কি বিবাদ ও কলহ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া ঈশ্বরের নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিতে পারিত, সুতরাং সমস্ত গৃহস্থই ধর্ম্মরূপ সুধাপানের অধিকারী হইয়া বিমলানন্দ ভোগ করিত।”

ব্রাহ্মণ যুবা মনোরঞ্জনের মুখে এই সমস্ত নীতিগর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে তাঁহার জ্ঞানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা গল্পে মগ্ন থাকাতে এত অধিক রাত্রি জানিতে পারেন নাই। এদিকে রাত্রি হওয়াতেও মনোরঞ্জন বাটী না আসায় পতিপ্রাণা মনোরমা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং আপন মন্দ ভাগ্য বিবেচনা করিয়া পতির নানা প্রকার অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। হায়! প্রাণনাথের হয়ত মাতৃ-বিয়োগ-কষ্ট আবার নবীভূত হইয়াছে, অথবা এই পাপীয়সী হত-ভাগিনী কোন অপরাধ, করিয়াছে কিম্বা অন্য কোন প্রকার মর্ম্মান্তিক কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকিবে, তাহাতেই প্রাণ-নাথের সংসারের প্রতি ঘৃণাবৃদ্ধি হওয়াতে এই চির-দুঃখিনীকে ত্যাগ করিয়া কোন নিষ্পাপ নির্জ্জন স্থানে পলায়ন করিয়াছেন। তিনি এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায়! অকৃত্রিম প্রণয়ের স্বভাবই এইরূপ; অকারণে কতই অমঙ্গল আশঙ্কা হয়! মনোরমার বৃদ্ধ শ্বশুর যথা সময়ে আহার করিয়া শয়ন করিয়াছেন সুতরাং বৃদ্ধ কিছুই জানেন না! মনোরঞ্জনদের বাটীতে বহুদিন হইতে একটি দাসী ছিল, মনোরমা সেই বৃদ্ধাকে লইয়া সমস্ত গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন এবং তাহাকে অত্যন্ত মান্য করিতেন। মনোরঞ্জনের আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব দেখিয়া সেই বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি এখন কেমন করিয়া

নিশ্চিন্ত রহিয়াছ তোমাদের বাবু যে এপর্য্যন্ত গৃহে আসিলেন না। তিনি কখনই ত এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথাও থাকেন না। তবে বোধ হয় কোন বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকিবে।

বৃদ্ধা মনোরমার এই সমস্ত কথা শুনিয়া ভীত মনে মনোরঞ্জনের উদ্দেশে বাহির হইতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন একজন ভৃত্য-সঙ্গে মনোরঞ্জন গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। বৃদ্ধা মনোরঞ্জনকে দেখিয়া আনন্দিত মনে মনোরমার নিকট গিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। মনোরমা পতির আগমনে পরমাহ্লাদিত হইয়া সত্বর আহার-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। স্বামীর ভোজনান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নাথ! আপনার অদ্য আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?" মনোরঞ্জন স্ত্রীকে ব্যগ্র দেখিয়া বলিলেন—"প্রিয়ে! আসিতে কেন এত বিলম্ব হইল তাহা আর অদ্য বলিবার সময় নাই, রাত্রি অধিক হইয়াছে, কল্য সমস্ত বিবরণ বলিব।

মনোরমা পতির বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। সরলা মনোরমা পতিকে কিছুমাত্র চিন্তাকুল অথবা ম্লান দেখিলে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেন। প্রাণনাথের কি কারণে গৃহে আসিতে এত বিলম্ব হইল তাহা অদ্যই বা কেন বলিলেন না, এই বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার সমস্ত রাত্রি কিছুমাত্র নিদ্রা হইল না। পরদিন স্বামীকে ঐ বিষয় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে মনোরঞ্জন পূর্ব্ব দিবসের আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিলেন এবং মনোরমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি

তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া মনে করিয়াছি” মনোরমা কহিলেন—“কি জিজ্ঞাসা করিবেন অনুগ্রহ করিয়া বলুন”। মনোরঞ্জন বলিলেন—“প্রিয়ে! স্ত্রীজাতির চরিত্র-বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে সেই সন্দেহ তোমার নিকট ভঞ্জন করিব ইচ্ছা করিয়াছি”।

মনোরমা স্বামীর কথা শুনিয়া বলিলেন—“নাথ! আমি স্ত্রীজাতির প্রকৃত বিষয় যত দূর জানিয়াছি নিবেদন করি শ্রবণ করুন। স্ত্রীজাতি যে“অবলা—সরলা”নাম প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা অন্যায় হয় নাই, কারণ তাহারা পুরুষ অপেক্ষা শতগুণে সরলা—স্ত্রীজাতির চিত্ত অতীব কোমল, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও আছে, তথাচ যে এত দোষের আকর হইয়াছে তাহার কারণ শিক্ষাভাব এবং সঙ্গদোষ। নাথ! বলিতে কি স্ত্রীজাতির প্রকৃতি যে কত অল্পেই দ্রব হয় তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। আমার বোধ হয় স্ত্রীজাতির প্রকৃতি এত কোমল বলিয়াই এত দোষের আকর হইয়াছে। উহাদিগকে যে পথে লইয়া যাইবে সেই পথই অবলম্বন করিবে, কিন্তু সৎপথ দেখাইয়া দেন এমন মহাত্মা তাঁহাদের ভাগ্যে অল্প যুটে। স্ত্রীলোকদের গল্প যদি অন্তরাল হইতে শ্রবণ করেন তাহা হইলে সে সকল যে কত ভয়ঙ্কর জানিতে পারিবেন। স্ত্রাজাতির প্রধান কর্ত্তব্য তাঁহারা উত্তমরূপে গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ এবং সন্তান সন্ততির প্রতিপালন, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় এদেশে তাহাও তাহারা উত্তমরূপ শিক্ষা পায় না। অতএব স্ত্রীজাতিকে কেবল দোষের আকর বিবেচনা করিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নয়। সকল স্বামীরই আপন

আপন পত্নীর চরিত্র-বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় " ।

মনোরঞ্জন স্ত্রীর এই সমুদয় জ্ঞানপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিত্য নিয়মানুসারে স্ত্রীকে পাঠ দিতে লাগিলেন ।

মনোরঞ্জনের পিতা কৃষিকর্ম্ম দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু তাহাতে যে আয় হইত তাহাতে অতি কষ্টেই সংসারনির্ব্বাহ হইত। মনোরঞ্জনের মাতার মৃত্যুর পর মনোরঞ্জনের সংসারে তাচ্ছল্য দেখিয়া হরিনাথও বিষয়কর্ম্মে কিছুমাত্র মনোযোগ দেন নাই সুতরাং মনোরমা যে সময় পতিগৃহে আগমন করিয়াছিলেন সে সময় তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল, কিন্তু মনোরমার পরিশ্রমে তাঁহাদের কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছিল। মনোরমা দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন এবং কি করিলে বৃদ্ধ শ্বশুর এবং পতির সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবতী ছিলেন, শারীরিক পরিশ্রমে তিনি কিছুমাত্র কাতর হইতেন না।

মনোরঞ্জন মনোরমার অলৌকিক গুণে দিন দিন মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তিনি সামাজিক সুখের নিমিত্ত সায়ংকালে কোন বন্ধুর বাটীতে গিয়া কথোপকথন এবং বিদ্যাধর্ম্মালোচনাদি করিতেন, কিন্তু এখন আর তাঁহাকে অন্য কোথাও যাইতে হইত না, সকল প্রকার সামাজিক সুখ তিনি স্ত্রীর সহবাসেই প্রাপ্ত হইতেন। প্রতিদিন নূতন বিষয়ের কথোপকথন, এবং তর্ক বিতর্ক করিয়া অতীব প্রীতী প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ইহাঁরা প্রাতঃকালে

উঠিয়া প্রথমে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন, পরে উভয়ে একত্র হইয়া এই ব্রহ্মোপাসনাটি পাঠ করিতেন—

"কোথা ওহে দীননাথ! পতিতপাবন!
প্রাতঃকালে স্মরি মোরা তোমার চরণ॥
তোমার কার্য্যেতে যেন হই হে তৎপর।
পাপ হতে দূরে রহে মোদের অন্তর॥
এই ভিক্ষা চাই মোরা প্রভুর নিকটে।
তোমারে ভুলিয়া যেন না পড়ি সঙ্কটে॥"

ধর্ম্মপরায়ণ দম্পতি সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মহামূল্য কোহিনুর হীরা এবং সুমার্জ্জিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ কত বা জ্যোতিঃ ধারণ করে, বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা স্ত্রীর জ্যোতিঃ শত শত হীরক অপেক্ষাও অধিক প্রতিভা বিশিষ্ট মহামূল্য হীরকাদি অঙ্গে ধারণ করিলে ঐহিক সুখ হয়, কিন্তু বিদ্যাবতী ধর্ম্মশীলা স্ত্রীর সহবাসে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাঁহারা এইরূপ বিদ্যা এবং ধর্ম্মালোচনা করিয়াই কালযাপন করিতেছেন কিন্তু আপনাদের জীবিকার কোন উন্নতি চেষ্টা করিতেছেন না, কেবল পিতার যে যৎসামান্য চাস ছিল তাহাতেই কষ্টে দিন যাপন করেন দেখিয়া হরিনাথের কোন আত্মীয় হরিনাথের নিকটে গিয়া কহিলেন "ওহে তুমি ত বৃদ্ধ হইয়াছ আর কেন বৃথা এই মায়াময় সংসারে মগ্ন আছ? মনোরঞ্জনের হস্তে সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বরের আরাধনায় অতিবাহিত কর।"

হরিনাথ বৃদ্ধের এই সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"ভাই! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ, কিন্তু আমি অতি হতভাগ্য। পুত্রোপার্জ্জিত ধন ভোগ বিধাতা আমার ভাগ্যে লিখেন নাই, যে দিন ব্রাহ্মণী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে সেই দিনই আমি সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়াছি। মনোরঞ্জন যে এখন গৃহে বাস করিতেছে এই আমার পরম ভাগ্য। মাতৃ-বিয়োগে ও যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সংসারে বৈরাগ্য প্রকাশ করিয়াছিল; কোন প্রবোধ মানিত না, সর্ব্বদা পাগলের ন্যায় বেড়াইত। কেবল ঈশ্বর কৃপা করিয়াছেন বলিয়াই আমি এখন পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতেছি, নতুবা আমার সে আশা ছিল না। আর আমি মনোহরের দ্বারা জানিয়াছি যে মনোরঞ্জন চাকরী করিবে না। চাস করিয়া জীবন যাপন করিবে। ইহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কারণ উহার যাহা অভিরুচি তাহাই করুক,ধর্ম্মপথে থাকিয়া শাকান্নও পরম তৃপ্তিকর জ্ঞান করিব"।

তাঁহাদের দুই বৃদ্ধে এবম্বিধ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় মনোরঞ্জন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মনোরঞ্জনের পিতার বন্ধু মনোরঞ্জনকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন—"বৎস! তুমি জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? তুমি কি জান না যে তোমার পিতার তাদৃশ সম্পত্তি নাই? তুমি ছেলে মানুষ, বাবু জান না পৃথিবীতে অর্থের যত গৌরব এত আর কিছুরই নয়। অর্থ না থাকিলে

কোন কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। অতএব অর্থাগমের কোন পথ অবলম্বন কর, যাহাতে বিনা ক্লেশে পুত্র কলত্রাদির ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পার তাহার চেষ্টা কর। তোমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি আর কত কালই বা জীবিত থাকিবেন, এখন বৃদ্ধ পিতাকে সংসারের ভার হইতে মুক্ত করিয়া আপনি সংসারের ভারগ্রহণ কর"।

মনোরঞ্জন দেখিলেন যে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু সকলেই চাকরী করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন এবং কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব বলাতে সকলেই তাঁহাকে পাগল মনে করিতেছে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে পিতার নগদ টাকা কিছুই নাই যাহাতে সুচারু রূপে কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে। এ অবস্থায় চাস করিলে অতি সামান্য লোকের ন্যায় চাস করিতে হইবে, তাহাতেও হয়ত বিনা ক্লেশে পরিবারের ভরণ পোষণ হইবে না। অতএব কিছুদিন চাকরী করাই উচিত বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধের নিকট "চাকরী করিব' বলিয়া সম্মত হইলেন, এবং চাকরীর উমেদারীতে বাহির হইলেন। নানা স্থানে বন্ধুবান্ধবদের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন, কোথায় উপযুক্ত কর্ম্ম খালি আছে কি না অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে মনোরঞ্জনের পরম সুহৃদ্ মনোহর গোরকপুর হইতে এক পত্র পাইলেন যে " কোন জমিদারের তরফে ২০০ শত টাকা বেতনের একটি কর্ম্মখালী আছে যদিকর্ম্ম করিবার ইচ্ছা থাকে ত শীঘ্র আসিবে "।

মনোরঞ্জন পত্র খানি পাইয়া চিন্তা-সাগরে মগ্ন হই-লেন, ভাবিলেন জমিদার মহাশয়দের শরীরে দয়ার লেশমাত্র নাই, ধর্ম্মভয় নাই, তাঁহাদের অর্থই পরম ধন, অর্থের খাতিরে তাঁহারা সর্ব্ব প্রকার পাপ-কর্ম্মে রত হইয়া থাকেন, জমিদারের অধীনে কিরূপে কাজ করিব! কিন্তু যখন চাকরী করিব স্থির করিয়াছি তখন "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পাতন" কপালে যা থাক চাকরী করিব! এইটি মনে মনে স্থির করিয়া মনোরমার নিকটে গেলেন। মনোরমার নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন মনোরমা পুত্র দুইটিকে নিকটে বসাইয়া শয়নের শয্যা প্রস্তুত করিতেছেন। তিনি পতিকে গৃহাগত দেখিয়া সহাস্য বদনে বসিবার আসন প্রদান করিলেন এবং হস্তস্থিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মনোরঞ্জন মনোরমার গৃহস্থালির সুশৃঙ্খলতা দেখিয়া আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন, কিন্তু অর্থাভাবপ্রযুক্ত দুঃখও হইল। তৎপরে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয়ে! তোমার ও কি কাজ হইতেছে?" মনোরমা কহিলেন—"কল্য কর্ত্তা মহাশয়ের শয্যার কষ্টে রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই অনেক দিনের তোষক খানি ছিন্ন হইয়াছে সেই জন্য তোষক খানিতে একটি নূতন কাপড় বসাইয়া পূর্ব্ববৎ করিতেছি, আর ত বেশী বিছানা নাই সেই জন্য অদ্যই ঐ খানি শেষ করিতে হইবে"।

মনোরঞ্জন মনোরমার এই কথা শুনিয়া অর্থের অভাব জন্য পরিবারের খুব কষ্ট হইতেছে জানিয়া দুঃখিত

হইলেন, এবং মনোরমার কি মত জানিবার জন্য কহিলেন—"প্রিয়ে! অর্থ না থাকিলে সময়ে সময়ে ভারি কষ্ট পাইতে হয়, অতএব অর্থোপার্জ্জন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।" মনোরমা মনোরঞ্জনের মুখে এই নূতন কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং প্রাণনাথের দিন দিন সংসারে মমতা হইতেছে জানিয়া আহ্লাদিত হই-লেন, কিন্তু কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া অধোবদনে রহিলেন। মনোরঞ্জন স্ত্রীকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিলেন—"প্রিয়ে! চুপ করিয়া রহিলে কেন? আবার মনোরমা কহিলেন—"হাঁ সকলেরই সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করা উচিত বটে অর্থ না থাকিলে মানুষের কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না"। মনোরঞ্জন কহিলেন—"দেখ প্রিয়ে! মনোহর গোরকপুর হইতে পত্র পাঠাইয়াছেন সেখানকার একজন জমিদারের তরফে কাজ করিতে হইবে, মাসে ২০০ টাকা বেতন পাওয়া যাইবে, তোমাদের যে রমক কষ্ট দেখিতেছি তাহাতে ত চাকুরী না করিলেও নয়।"

মনোরমা গোরকপুর এবং জমিদারের অধীনে কাজ এই শুনিয়াই কম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন—" নাথ! তুমি কি আমায় উপহাস করিয়া বলিতেছ? কারণ তোমার চাকরীতেই বিশেষ অভক্তি, তাহাতে জমিদারের অধীনে এবং গোরকপুরে, এ চাকরীতে তুমি স্বীকার করিবে ইহা আমার কোন মতে বিশ্বাস হইতেছে না। বিশেষতঃ তুমি চাস করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে বলিয়াছ।" মনোরঞ্জন স্ত্রীর কথা শুনিয়া কহিলেন—" প্রিয়ে! তুমি যাহা বলিতেছ যথার্থ

কিন্তু আত্মীয় বন্ধু সকলেই চাকরী করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন এবং 'চাস করিব' বলাতে পাগল মনে করিতেছেন। আর ভদ্র লোককে চাস করিতে হইলে যে সামান্য টাকার আবশ্যক হয় তাহাও ত আমার নাই সুতরাং চাকরী করাই সর্ব্বপ্রকারে বিধেয়। অতএব তুমি আর ইহাতে কিছু আপত্তি করিও না। আমি পরশ্ব দিবস গোরকপুর যাইবার দিন স্থির করিয়াছি, জীবিত থাকি ত অবশ্যই পুনর্ম্মিলন হইবে"। এই কথা শুনিয়া মনোরমা বাষ্পপূর্ণনয়নে গদগদবচনে কহিলেন— "জীবিতেশ্বর! আমি যে চিরদুঃখিনী তাহা ত তোমার অগোচর নাই, বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া এক প্রকার সংসারের সকল সুখেই বঞ্চিত হইয়াছিলাম, কেবল দয়াময় জগৎপিতার কৃপায় তোমাকে আশ্রয় পাইয়াছি বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিতেছি। এখন তুমি দূরদেশে গমন করিলে আমি কেমন করিয়া জীবিত থাকিব এবং বৃদ্ধ শ্বশুর আর পুত্র দুইটিকে লইয়া কি রূপে কালযাপন করিব? অতএব আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চল"। মনোরঞ্জন মনোরমার এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"প্রিয়ে! তোমার এ অনুরোধ করা নিতান্ত অন্যায়, আমার কি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইতেছে না? তবে তোমাদের কষ্ট দূর করিবার চেষ্টায় যাইতেছি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া কষ্টে কালযাপন করিব। মনোরমে! তোমার ত মনকে প্রবোধ দিবার উত্তম উপায় রহিয়াছে।"

মনোরমা মনোরঞ্জনের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন— "আমি মনকে কি এই বলিয়া বুঝাইব যে প্রাণনাথ আমার সুখস্বচ্ছন্দতা বাড়াইবার জন্য বন্ধুহীন দূরদেশে গমন করিয়াছেন? আমাকে সুখী করিবার জন্য নির্দ্দয় অধার্ম্মিক অর্থপ্রয়াসী জমিদারের অধীনে বাস করিতে-ছেন? প্রাণনাথ! এই সব মনে করিয়া আমি কিরূপে কালযাপন করিব?"

এই কথা বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। মনোরঞ্জন মনোরমাকে নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিয়া পিতার নিকট গিয়া আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের মনের গতি ফিরিয়াছে জানিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া একটি শুভ দিন দেখাইলেন। মনোরঞ্জন নির্দ্ধারিত দিনে পিতাকে প্রণাম করিয়া পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া গোরকপুর যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল মনোরমা অন্তরাল হইতে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনোরঞ্জন যখন দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন তখন মনোরমা অন্তরালে গিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে ধিক্কার দিয়া কতই দুঃখ করিতে লাগিলেন।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পতিকে দূরদেশ পাঠাইয়া পতিপ্রাণা রমণী মহাকষ্টে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন, পতির মঙ্গলের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেন এবং বৃদ্ধ শ্বশুরের প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিলেন এবং সন্তান দুইটিকে লইয়া কষ্টে দিনযাপন করিতেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইল। বৃদ্ধ পুত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, সর্ব্বদাই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। এইরূপ দুর্ভাবনায় অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ "গৃহিনীরোগে" আক্রান্ত হইলেন। মনোরমা শ্বশুরকে পীড়িত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া মনোরঞ্জনকে পত্র লিখিলেন এবং আপনি বিশেষরূপে যত্ন করিতে লাগিলেন। শ্বশুরের ব্যাধিশান্তির নিমিত্ত একটি বিজ্ঞ বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন এবং সুনিয়মে পথ্য দিয়া ব্যাধিনিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের রোগ শান্তি হইবার নয়, দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মনোরমা পতিকে বিদেশগামী এবং শ্বশুরের এইরূপ ব্যাধি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী মনোরমা আপনার ধৈর্য্য গুণের বশীভূত হইয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে আমি অধৈর্য্য হইলে পুত্র দুইটির এবং বৃদ্ধ শ্বশুরের

আহার দিবার আর অন্য লোক নাই। এইরূপে মনের কষ্ট মনেই নির্ব্বাণ করিতেন। বৃদ্ধ আপন মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া আত্মীয় বন্ধু সকলকে নিকটে ডাকিলেন এবং আপন পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, কারণ সেই দিবসেই মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

মনোরমা শ্বশুরের মৃত্যুতে অতীব অধৈর্য্য হইলেন এবং আপনাকে নিতান্ত অসহায় জানিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। বহুদিবস পতির কোন সংবাদ না পাইয়া ভীত হইলেন এবং কিরূপে পতির সংবাদ পাইবেন ভাবিতে লাগিলেন এইরূপ এক দিন পতিচিন্তায় মগ্ন আছেন এমন সময় তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয় শিশুসন্তানটি একখানি পত্র হাতে লইয়া জননীর নিকট গিয়া কহিল "মা! এক জন লোক বাহির বাটিতে আসিয়াছিল সে এই পত্র খানি আমার হাতে দিয়া গেল।"

মনোরমা পুত্রের মধুর কথা শুনিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে যথার্থই এক খানি পত্র হস্তে করিয়া বালক দাঁড়াইয়া আছে। তিনি পতির হস্তাক্ষর চিনিতে পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রের হস্ত হইতে পত্র খানি গ্রহণ করিলেন এবং চুম্বন করিয়া ঈশ্বরের নাম লইয়া পত্রখানি খুলিতে লাগিলেন। পত্রখানি খুলিতে আরম্ভ করাতে তাঁহারা দক্ষিণ অঙ্গ স্পান্দন হইয়া উঠিল, তিনি অমনি চমকিত হইয়া উঠিলেন মনে মনে পতির অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া পত্রখানি খুলিতেছেন এমন সময় তাঁহার

প্রিয়সহচরী মনোহরের স্ত্রী, আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মনোরমা একখানি পত্র হস্তে অশ্রুমুখী হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া মনোরমার নিকটে আসিয়া "কি পত্র" বলিয়া পত্র খানি তাঁহার হস্ত হইতে লইলেন এবং কহিলেন—" এ যে মনোরঞ্জন বাবুর পত্র দেখিতেছি, তবে তুমি এত ভীত এবং চিন্তিত হইয়া পত্রখানি লইয়া বসিয়া আছ কেন?" মনোরমা কহিলেন—"সখি! যথার্থ কি এ তাঁহার নিজ হস্তাক্ষর? যদি তাহাই হইবে তবে আমার হৃদয় এরূপ কম্পিত হইতেছে কেন? ভয়ে যে পত্র খুলিতে পারিতেছি না, তবে বুঝি প্রাণনাথের কিছু অমঙ্গল হইয়াছে?" মনোহরের স্ত্রী কহিলেন—"ভগিনি! তুমি এরূপ নির্ব্বোধের মত কথা কহিতেছ কেন? দেখিতেছ না এ তাঁহার নিজ হস্তাক্ষর, তবে আবার অমঙ্গল কি? ছি ভাই! তুমি বড় পাগলামি করিতেছ, অত অধৈর্য্য হইলে কেন?"মনোরমা তাঁহার হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া আবার খুলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পত্র খুলিতে না পারিয়া পত্র খানি নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন এবং মনোহরের স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন"—প্রিয় ভগিনি! তুমি যদি আমার হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিতে তাহা হইলে আমার হৃদয়ের গতি কিরূপ হইয়াছে জানিতে পারিতে, বোধ হয় ইহাতে কিছু অমঙ্গল সংবাদ আছে" মনোহরেব স্ত্রী তাঁহার হস্ত হইতে পত্র লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। /

পত্র ।

মিনতি করিয়া বলি ওহে রক্ষিগণ !
ক্ষণেক সময় দাও আমারে এখন ॥
হস্তের শৃঙ্খল খুলে দাও একবার ।
গোটাকত কথা লিখি প্রিয়ারে আমার ॥
করযোড়ে নত শিরে কহি বারে বার ।
একবার মুক্ত হস্ত কর রে আমার ॥
শৃঙ্খল রহিল বাঁধা আমার চরণে ।
মুক্ত হস্ত হলে বল পালাব কেমনে ॥
দুঃখের লাঘব কর বন্ধন খুলিয়া ।
প্রিয়ারে দুঃখের কথা জানাব লিখিয়া ॥
বলিতে বলিতে হলো অরুণ নয়ন ।
কাঁদিয়া অস্থির প্রিয়ে ! হলাম এখন ॥
গণ্ড বয়ে অশ্রু পড়ে ভাসে বক্ষ:স্থল ।
হস্ত পদ বাঁধা আছে কে মুছাবে জল ?
ঘরেতে আছেন প্রিয়া সাধ্বী পতিব্রতা ।
জানে না সে সব এই দুর্দ্দশার কথা ॥
অনেক মিনতি প্রিয়ে ! করিয়া রক্ষিকে ।
তবে এই পত্র খানি লিখিছি তোমাকে ॥
শুনরে দুঃখের কথা প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি !
অথবা এ সম্বোধনে নহি অধিকারী ॥
আমি ত অধম অতি মহাপাপাচারী ।
কেমনে বলিব আর "প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি" ॥

অর্জ্জন করিয়া সুখী হব দুই জনে।
এই বড় সাধ প্রিয়ে! ছিল মনে মনে ॥
এই হেতু আসিয়াছি বন্ধু-হীন স্থানে।
কষ্ট সার হ'লো প্রিয়ে! আসিয়া এখানে ॥
তোমারে করিব সুখী এই বড় সাধ।
এমন জানিনা প্রিয়ে! ঘটিবে প্রমাদ ॥
প্রাণত্যাগ হ'লে হায়! যায়গো জঞ্জাল।
কষ্টেতে কেবল প্রিয়ে! কাটালাম কাল ॥
মরি তায় ক্ষতি নাই ভাবি এই মনে।
কষ্টেতে প্রিয়ারে আমি ফেলিব কেমনে?
আমিত অভাগা এই ভারতভিতরে।
নানা মতে দুঃখ প্রিয়ে! দিলাম তোমারে ॥
মনোগত কথা কিছু জানাই তোমারে।
কেমনে চলিবে প্রিয়ে! এঘোর সংসারে ॥
ভক্তিভাবে ভ'জো সদা নিত্য নিরঞ্জন।
অশরণে যিনি সদা করেন রক্ষণ ॥
ঈশ্বর জগৎপিতা অনাথের নাথ।
তাঁহার চরণে সদা ক'রো প্রণিপাত ॥
ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারী, প্রিয়ে! যথা তথা যায়।
জ্ঞান-বল্গা দিয়া জোরে রেখরে তাহায় ॥
কি জানি কুপথে গতি হয় যদি তার।
অনন্ত সুখের আশা রবে নাগো আর ॥
পরের দেখিয়া সুখ চঞ্চল হ'য়োনা।
পৃথিবীর সুখ কিছু স্থায়ী তো হবেনা ॥

শমন আসিয়া যবে করিবেক গ্রাস।
কোথায় রহিবে তব এ সুখের আশ॥
সে সুখের লাগি লোক পাপ কেন করে।
বিষয়বাসনা-কূপে ডুবে কেন মরে?
পাপ-কূপে ডুবিলে যে নাহি পরিত্রাণ।
অতএব বলি প্রিয়ে! হ'য়ো সাবধান॥
নিতান্ত তোমারি আমি মনে যেন থাকে।
অস্থি চর্ম্ম সার হলো ভাবিয়া তোমাকে॥
তোমার মঙ্গলচেষ্টা করিলাম যত।
কপাল-দোষেতে সব হ'লো মোর হত॥
কত শত সাধ মোর ছিলগো মনেতে।
কিছু নাহি পারিলাম পূরণ করিতে॥
তোমারে ভাবিতে গিয়া অন্যমনা হয়ে।
চিরকাল রহিলাম কারাবন্দী হয়ে॥
আর দেখিব না বুঝি তোমার সে মুখ।
দেখিয়া যে মুখ আমি ভুলেছিনু দুখ॥
আর শুনিব না বুঝি মধুমাখা বাণী।
দুখে সুখ মানিতাম শুনিয়া যে ধ্বনি?
প্রাণে যদি মরি তাহে কিছু দুঃখ নাই।
প্রাণান্ত হইলে প্রিয়ে! সকল এড়াই॥
এক আশে কিন্তু হায়! হলেম নিরাশ।
তবগুণ না করিলাম জগতে প্রকাশ॥
এই বড় সাধ মনে ছিলগো আমার।
অসামান্য গুণ তব করিব প্রচার॥

সত্য পথে থেকে যদি ধর্ম্ম রক্ষা কর।
অবশ্য তেমার গুণ হইবে প্রচার ॥
কোমল সরল মন হয় তব প্রিয়ে ! ।
পাপী বলে মোরে পায়ে দিওনা ঠেলিয়ে ॥
যখন করিবে তুমি ঈশ্বর-পূজন।
সে সময় অভাগারে করিও স্মরণ ॥
প্রাণের সন্তান দুটি আছে তব কাছে।
জানি না তাদের ভালে কত দুঃখ আছে ॥
বিধিমতে করো প্রিয়ে ! তাদের পালন।
কভু যেন তাহাতে না হয় অযতন ॥
জনক-জননী-গুণ সদা হয় মনে।
তাঁহাদের স্নেহ আমি ভুলিব কেমনে? ॥
অদ্যাবধি হ'লো প্রিয়ে ! লিপি সমাপন।
আর না করিব কভু " প্রিয়া " সম্বোধন ॥
আর কি নির্জ্জনে প্রিয়ে! বসিব দুজনে।
কহিব দুঃখের কথা যত আছে মনে ? ॥
আর কি হে নিশাকালে বসি একাসনে।
আত্মা সমর্পিব সেই বিভুর চরণে ?॥
আর কি সুধাংশুমুখি! ধরি তব কর।
কহিব মনের কথা খুলিয়া অন্তর ?॥
আর কি জীবিতেশ্বরি ! বলিব তোমায়।
"অপরাধ করিয়াছি ক্ষম হে আমায় ?"॥
আর কি প্রকৃতি তুমি প্রচণ্ড দেখিয়া।
বলিবে " কি হবে নাথ " নিকটে আসিয়া ?॥

গ্রীষ্মের তপনতাপে তাপিত হইয়া।
শীতল হ'তেম প্রিয়ে ! তোমারে দেখিয়া ॥
আর কি প্রাণের সখি ! বলিব এমন।
" প্রকৃতির শোভা এসো করি দরশন ?" ॥
আর কি বর্ষার কালে জলের পতনে।
আনন্দেতে দৃষ্টিপাত করিব দুজনে ?॥
নিম্নগা জলদজলে দেখিয়া নয়নে।
অপার আনন্দ প্রিয়ে ! পাইতাম মনে ॥
আর কি শরৎ-রাজে আসিতে দেখিয়া।
মৃদু মৃদু হাস্য মুখে বলিবে আসিয়া ॥
"এসো চল যাই নাথ ! ছাতের উপরে।
শোভিত হয়েছে ধরা চন্দ্রমার করে ॥
এই মত কত মত তুষিতে আমায়।
আর কি ঘুচিবে দুঃখ দেখিয়া তোমায় ? ॥
আর কি বসন্তকালে একত্রে বসিয়া।
গাইব বিভুর গুণ প্রফুল্ল হইয়া ? ॥
নাহি জানিতাম আগে এমন হইবে।
সুখের ভরসা যত ভাসিয়া যাইবে ॥
অধিক কি আর প্রিয়ে ! বলিব তোমাকে।
"তোমা বই কারু নই" মনে যেন থাকে ॥
এই বলে পত্র প্রিয়ে ! করি সমাপন।
তোমায় বিভুর পদে করিয়া অর্পণ ॥
দেখা যদি পাই তবে বলিব সকল।
নতুবা আমার মনে জ্বলিবে অনল ॥

মনোরমা পত্রের কিয়দংশ শ্রবণ করিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় হা নাথ! বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মনোহরের স্ত্রী দেখিলেন যে মনোরমা নয়ন মুদ্রিত করিয়া আর কোন কথা বলিতেছেন না, তখন তিনি পত্রখানি রাখিয়া মনোরমার গায়ে হাত দিয়া উঠাইতে লাগিলেন এবং মনোরমাকে চৈতন্যশূন্য দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। ছেলে দুইটি জননীর মুখে মুখ দিয়া "মা মা" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল! তাঁহাদের বাটীতে বহুকালাবধি যে একটী দাসী ছিল সে ছেলে দুইটিকে কোলে লইয়া "হা বাছা মনোরঞ্জন!" ইত্যাদি বলিয়া নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। পার্শ্বস্থ লোকেরা মনোরমার মুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মনোরমা চৈতন্য লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি কি করিতেছি, প্রাণনাথের অমঙ্গল করিতেছি, প্রাণনাথ ত আমার জীবিত আছেন, এখন যে কোন উপায়ে পারি গোরকপুরে যাত্রা করি এবং কোন প্রকারে যদি প্রাণনাথকে স্বদেশে আনিতে পারি তাহার চেষ্টা করি।"

এই বলিয়া আপন পুত্র দুইটিকে মনোহরের স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন—"ভগিনি! অদ্যাবধি এই সন্তান দুইটির প্রতিপালনের ভার তোমার হস্তে দিলাম, যদি ফিরিয়া আসি তাহাহইলে আমার সন্তান আমি লইব, নতুবা তোমারি হইল—আমি জন্মাবধি দুঃখভোগই করিতেছি। বিধাতা বোধ হয় দুঃখভোগ করিবার জন্যই আমায়

সৃষ্টি করিয়াছেন। সখি! আমি আপনি কষ্ট পাই তাহাতে কিছুমাত্র ভয় করি না, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ যাঁহার জন্য চিন্তা করি এবং যাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হইলে আমার অসহ্য হয়, সেই প্রাণনাথ আমার কষ্ট পাইতেছেন!—আমি যে অসহায়া” এই বলিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া আবার—“হা জীবিতেশ্বর! আমি যে নিতান্ত অসহায়া হইয়াছি! হায়! কি করি!” এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং দাসীটিকে ডাকিয়া কহিলেন—“তুমিই আমার এক মাত্র সহায়, অতএব তুমি যদি আমার সঙ্গে গোরকপুর যাইতে পার তাহা হইলে প্রাণেশ্বরকে কারামুক্ত করিয়া আনিবার চেষ্টা করি।”

বহু কষ্টে মনোরমা সে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে দাসীটিকে সঙ্গে লইয়া গোরকপুর যাত্রা করিলেন। বালক দুইটিকে পশ্চাতে রাখিয়া যাওয়াতে তাঁহার যে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

ইতিপূর্ব্বে তিনি আর কখন গৃহের বাহির হন নাই, সুতরাং কোন পথ দিয়া গোরকপুর যাইতে হয় তাহার কিছুই জানেন না। কিয়ৎদূর গিয়াই গোরকপুর কোন পথে যাইতে হইবে পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা দাসী মনোরমার এই দুঃসাহসিকতা দেখিয়া বলিল—“তুমি পথ ঘাটের কিছুই জান না, তবে কোন সাহসে বাছা বাড়ীর বাহির হইলে? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াই বা তুমি কতদূর যাইবে? আর তোমার এই কোমল

শরীরে পথের নানা কষ্টই বা কিরূপে সহ্য হইবে?" মনোরমা দাসীর এবম্বিধ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"মা তুমি আমার এই অল্প কষ্টকে অধিক মনে করিতেছ কেন? একবার মনে করিয়া দেখ দেখি তোমার পালিত পুত্র কি কষ্ট পাইতেছেন" এই কথা বলিতে বলিতে মনোরমা বাত্যাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূৰ্চ্ছিত হইলেন।

দাসী মনোরমার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং তাড়াতাড়ী জলাশয় হইতে জল আনয়ন করিয়া তাঁহার মুখেও চক্ষুতে দিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে মনোরমার চৈতন্য হইল। চেতনা পাইয়া মনোরমা দাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"বাছা! এত অধিক ক্ষণ ধরিয়া বিশ্রাম করিলে আমাদের গোরকপুর যাইতে বিলম্ব হইবে—এরূপ দেরি করিলে চলিবে না, তুমি আমাকে তুলিয়া দাও নাই কেন?" বৃদ্ধা বধূমাতার এবম্বিধ কথা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল—"বাছা! তুমি যে বেঁচে উঠলে এই আমার পরম ভাগ্য"।

অনন্তর মনোরমা গাত্রোত্থান করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। দাসী মনে মনে কহিতে লাগিল—"কতক্ষণে রেলের গাড়ি পাইব, রেলের গাড়ি পাইলে ইহার তাড়াতাড়ীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই। রেলে কতদূরই বা যাইব, ঊৰ্দ্ধ সংখ্যা গাজিপুর পর্য্যন্ত, আবার ত হাঁটিতে হইবে।"

কতক হাঁটিয়া কতক রেলে এইরূপে মনোরমা অষ্টম দিবসে গোরকপুরে পঁহুছিলেন। গোরকপুর পঁহুছিয়াই

শ্রবণ করিলেন তিন দিবস হইল মনোরঞ্জন নির্দ্দোষী প্রমাণ হওয়াতে কারামুক্ত হইয়া অযোধ্যা গমন করিয়াছেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মনোরমা নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন—প্রাণনাথ কারামুক্ত হইয়া বরাবর বাড়ী না গিয়া অযোধ্যা কেন গেলেন? তাঁহার অযোধ্যা যাইবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমার মনে যে নানা অশুভ আশঙ্কা হইতেছে। অতএব আমি অযোধ্যা পর্য্যন্ত গিয়া জীবেতেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

পতিপ্রাণা সাধ্বী এই সংকল্প করিয়া অযোধ্যামুখে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মনোরঞ্জন কারামুক্ত হইয়া আপন অদৃষ্টের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, আর লোকালয়ে মুখ দেখাইব না, যেদিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইব, কোন জনশূন্য অরণ্যে গিয়া বাস করিব, মনুষ্য-সমাজে আর যাইব না। এই স্থির করিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া অযোধ্যামুখে গমন করিতে লাগিলেন! যাইতে যাইতে তাঁহার মনোরমার অলৌকিক গুণসমূহ মনে হইতে লাগিল, আর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করা নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ হইবে এই মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় অধিক ব্যাকুলিত হইতে লাগিল।

মনোরমা স্বামীর অন্বেষণে অযোধ্যায় যাইতে যাইতে বন জঙ্গল যত অতিক্রম করিতে লাগিলেন, ততই ভাবিতে লাগিলেন যে, হায়! প্রাণনাথ এই দুর্গম বন

দিয়া একা যাইতে না জানি, কতই কষ্ট পাইয়াছেন। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছেন, কেবল একমাত্র দাসী সহায়, সন্ধ্যা উপস্থিত, আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন, নিকটে কোন আশ্রয় পাইবার আশা আছে কিনা তাহাও কিছুই জানেন না; আশ্রয় পাইবার আশায় দ্রুত গমনে পদচালনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আশ্রয় পাইবার পূর্ব্বেই ঘোরতর মেঘগর্জ্জন হইয়া ঝর ঝর বৃষ্টি আরম্ভ হইল, কেবল বিদ্যুতের আলোতে যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া বিদ্যুতের আলোতে একটি ভগ্ন প্রকাণ্ড মন্দির দেখিতে পাইলেন। মন্দির দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে পদ চালনা করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, এই মন্দিরে গিয়া অদ্য হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করি, এই ভাবিয়া মন্দিরের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া মন্দিরমধ্যে যেমন প্রবেশ করিবেন অমনি "তোমারা কে" এই গম্ভীর শব্দ দুইবার তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। পুরুষের স্বর বুঝিতে পারিয়া ভয়ে নিতান্ত জড়ীভূতপ্রায় হইয়া মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন— "হায়! এই বিজন স্থানেও আবার মনুষ্যশব্দ পাইলাম, কিন্তু ঐ মনুষ্য যে রকমেরই হউক না আমাদের উত্তর দেওয়া উচিত, উত্তর না দিলে কি জানি পাছে আপন অনিষ্টকারী জ্ঞানে আমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করে" এই ভাবিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন—"বাছা! উত্তর দাও, বল আমরা দুইটী অনাথ বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, পথ হারাইয়া এই মন্দির

মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি, এই ঘোর রজনীতে আমাদিগকে এই আশ্রমে একটু স্থান দিলে আমরা কৃতার্থ হই এবং ঈশ্বর-সন্নিধানে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি, পথিক এই কথা শুনিয়া কহিলেন—"ভয় নাই তোমরা নির্ভয়ে রজনী যাপন কর, এ শিব-মন্দির, এখানে আসিতে কোন আশঙ্কা নাই, তোমাদের প্রতি কোন অত্যাচার না হয় আমি সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক রহিলাম, তোমরা নির্ভয়ে বিশ্রাম কর। এই সকল কথা শুনিয়া মনোরমার ভয়ের কিছু লাঘব হইল। আপন ভাল মন্দের ভার ঈশ্বরসমীপে সমর্পণ করিয়া বিশ্রাম আশায় শয়ন করিলেন। বহুকালের পর কিছু গাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে যখন দিনমণি পূর্ব্বদিক্ আলোকময় করিয়া উঠিয়াছে এবং সেই সূর্য্যরশ্মি তাঁহাদের গাত্রে পতিত হইয়াছে এমন সময় তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, অমনি চকিত হইয়া উঠিলেন এবং হায়! এত বেলা পর্য্যন্ত কেন নিদ্রা গেলাম, এতক্ষণ ২।৪ ক্রোশ ছাড়াইয়া যাইতে পারিতাম, এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে যেমন মন্দিরের বাহিরে আসিতেছেন অমনি কতকগুলি বৃক্ষশাখা পতিত রহিয়াছে এবং তাহার মধ্যে এক খানি নিজ হস্তা-ক্ষরের লিপি পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া পত্রখানি তুলিয়া লইলেন, এবং নিজ হস্তাক্ষর চিনিতে পারিয়া পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন, আদ্যোপান্ত পত্র পাঠ করিয়া চিনিতে পারিলেন যে আপনি ইতি পূর্ব্বে যে পত্র খানি মনোরঞ্জনকে দিয়াছিলেন এই সেই পত্র। হায়! এই অভাগিনীর হস্তাক্ষর—লিপি কিরূপে এখানে আইল!

তবে কি প্রাণনাথ এই মন্দিরে কোন সময় উপস্থিত হইয়া থাকিবেন? গত রজনীতে যে ধার্ম্মিক পুরুষ আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন তিনিই কি হতভাগিনীর হৃদয়ানন্দদায়ক হইবেন? কল্য রজনীতে সেই দয়ান্ পুরুষের স্বর শুনিয়া আমি এবং বৃদ্ধা উভয়েই চমকিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আমার প্রাণনাথের স্বরের অনেক সাদৃশ্য ছিল। হায়! আমি অপর পুরুষ জ্ঞানে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম না। হায়! যদি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতাম তাহা হইলে এইখানেই আমার সকল কষ্টের অবসান হইত। হায়! আমি কি হত বুদ্ধির কাজ করিয়াছি। ইত্যাদি নানা প্রকার অনুতাপ করিতে করিতে অশ্রুমুখী হইয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কোথাও আর কোন চিহ্ন না পাইয়া আপন অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার দিয়া অযোধ্যাভি মুখে পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। পথে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া অযোধ্যা পঁহুছিলেন। অযোধ্যা গিয়া শ্রবণ করিলেন যে তিনি অযোধ্যায় ঘণ্টা পাঁচ ছয় বিশ্রাম করিয়া নৈমিষারণ্যে গমন করিয়াছেন। মনোরমা এই সমাচার শ্রবণ করিয়া নৈমিষারণ্যের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যা হইতে পাঁচ দিন ক্রমাগত চলিয়া নৈমিষারণ্যে গিয়া মনোরমা জানিতে পারিলেন যে তিনি জনকপুর গমন করিয়াছেন। মনোরমা কালবিলম্ব না করিয়া জনকপুরাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। নানা কষ্টে জনকপুরে উপস্থিত হইলেন। এবং তথায় নানাস্থানে পতির অনুসন্ধান

করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই আর স্বামীর সন্ধান পাইলেন না। তখন নিতান্ত হতাশ হইয়া বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মা! তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহাতে চিরকালের জন্য তোমার নিকট ঋণী রহিলাম, কিন্তু মা! আমি তোমার কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। এখন আর তোমার কষ্ট পাইবার আবশ্যক নাই, তুমি স্বদেশে গমন কর। মা! তোমায় আরো এক অনুরোধ করিতেছি—আমার সেই অনাথ সন্তান দুইটি যাহাদিগকে ইহলোকে আমার বলিতে আর কেহই নাই, সেই বালক দুইটির যত্ন করিও, অধিক আর কি বলিব—হায়! বাছারা আমার যখন এই চিরদুঃখিনী হতভাগিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তখন তাহাদের অদৃষ্টে সুখ নাই, চিরকাল কষ্টেই গত হইবে।"

মনোরমা এই সকল কথা বলিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া যেদিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে লাগিলেন। মনোরমা যদিও বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিলেন, কিন্তু মনোরমাকে ফেলিয়া যাইতে তাহার কোন মতে মন উঠিল না। বৃদ্ধা অনিমিষ নয়নে মনোরমার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মনোরমা ক্রমে ক্রমে যখন দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন তখন বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, এবং সন্ধ্যার পর কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধার রোদনশব্দ শুনিয়া এক জন পথিক তাহার নিকটে গিয়া কহিল—"বাছা! তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি এই রাত্রিকালে রোদন

করিতে করিতে কোথায় যাইতেছ? এবং কি জন্যই বা রোদন করিতেছ? বৃদ্ধা কোন উত্তর না দিয়া গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। যুবা বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে বৃদ্ধা কুপিত হইয়া কহিল—"কেন বাবু! তুমি আমাকে বিরক্ত করিতেছ? আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তোমার কি লাভ হইবে? আর আমারই বা দুঃখের কি লাঘব হইবে? আমি এই অন্ধকার-রাত্রে কিরূপে গ্রামে স্থান পাইব তাহার চেষ্টা দেখি। যুবা ব্যক্তি কহিল—"বাছা! আমিও এক জন হতভাগ্য পথিক, তোমার রোদনশব্দ শুনিয়া কেমন আমার হৃদয় ব্যাকুলিত হইতেছে, সেই জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আপনার রোদনের কারণ বল, যদি আমার সাধ্য হয় আমি প্রাণপণে তোমার কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিব, এবং এই অন্ধকার-রজনী যাপনের উপায় করিয়া দিব।"

দাসী কহিল—"যদি অদ্যকার রাত্রি যাপনের উপায় করিয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি এখানে বিলম্ব করিতে পারি, নতুবা আমি এখানে বিলম্ব করিলে আজিকার রাত্রি কাটান ভার হইবে। কিন্তু বাছা! তোমার দয়াপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া আমার দয়ালু মনোরঞ্জনের কথার মত বোধ হইতেছে।" বৃদ্ধার এই কথাটি শুনিয়াই মনোরঞ্জন বুঝিতে পারিলেন যে আমাদেরই জন্য বৃদ্ধা রোদন করিতেছে। তখন মনোরঞ্জন আর বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া মনোরমার সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। বৃদ্ধা আস্তে আস্তে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

মনোরঞ্জন কিয়দ্দূর শ্রবণ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাছা! দুঃখিনী মনোরমা পতির উদ্দেশে কোন দিকে গিয়াছে বলিতে পার?"

বৃদ্ধা মনোরমাকে যেখানে ছাড়িয়া আসিয়াছেন সেই স্থান বলিয়া দিলেন। মনোরঞ্জন আর কালবিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধাকে আপন আলাপি এক দোকানে রাখিবার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন তাঁহার চিরসহচর মনোহর সেই স্থানে তাঁহাদের অন্বেষণে বেড়াইতেছে।

মনোহর হঠাৎ মনোরঞ্জনকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ মনোরঞ্জনের সে রূপ নাই, সে কান্তি নাই, মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বৃদ্ধাকে চিনিতে পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো ঝি নাকি? তুমি এখানে কেমন করিয়া আইলে! তোমার প্রাণাধিক মনোরঞ্জন এবং বধূমাতা কোথায়? আমি আজ সাত দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উদ্দেশ পাই নাই।" বৃদ্ধা মনোহরের কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কহিল—"কেও মনোহর বাবু! বাবা! আর কি মনোরঞ্জনের দেখা পাইব; আর আমার মনোরঞ্জন যে পথে গিয়াছে বধূমাতাও সেই পথে গিয়াছেন। আমি কি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতাম, কি করি, সেই হতভাগা বালক দুইটির যে আর আপনার বলিতে কেহই নাই, জানি না তাহারা পিতামাতাকে ছাড়িয়া কিরূপে কালযাপন করিতেছে। তাহাদের জন্যই আমি গৃহে যাইতেছি, নতুবা

আমার মনোরঞ্জন যে পথে গিয়াছে আমিও সেই পথে যাইতাম ”। তাহাদের এই প্রকার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনোরঞ্জন আর আত্মগোপন করিতে না পারিয়া কহিলেন— “তোমাদের হতভাগা মনোরঞ্জন এই এখনও জীবিত আছে।” তৎপরে মনোহরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“সখে! এসো এসো আর বিলম্ব করিব না, এখন শীঘ্র প্রাণপ্রতিমা মনোরমার অন্বেষণ করি ”। এবং বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“বাছা! তুমি আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র গৃহে গমন কর, সেই অসহায় বালকদ্বয়ের সমস্ত ভার তোমারই উপর রহিল ”।

এই বলিয়া দুই সখাতে মনোরমার অন্বেষণে চলিলেন। এদিকে মনোরমা স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া পতি বিরহ অসহ্য হওয়ায় অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিব স্থির করিয়া এক নির্জ্জন বনপ্রান্তে গিয়া সমস্ত রাত্রি বন হইতে শুষ্ক পত্র এবং কাষ্ঠ আহরণ করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে যখন সমস্ত বনবিহারী বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান করিয়া উঠিল, এবং ভাস্কর নব রক্তিমায় পূর্ব্বদিক্ শোভিত করিলেন, সেই সময় পতিবিরহিনী মনোরমা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিলেন। অগ্নির শিখা যখন গগন স্পর্শ করিল, তখন তিনি এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে অগ্নির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন ;—

কোথায় হে দীননাথ! দাও দরশন।
অভাগিনী আত্মপ্রাণ দেয় বিসর্জ্জন ॥
পতির বিরহ আর সহিতে না পারি।

সুখী হব দগ্ধ প্রাণ বিসর্জ্জন করি ॥
চির দুঃখী করি মোরে সৃজেছেন বিধি।
দুঃখিনীর ভাগ্যে হ'লো পতি গুণনিধি।
আশ্রয় পাইয়া আমি ভাবিলাম মনে।
দুঃখের লাঘব বুঝি হলো এত দিনে ॥
বাড়িবে এতেক দুঃখ নাহি জানি মনে।
হৃদয় জ্বলিছে মোর সহিব কেমনে ॥
স্ত্রীলোকের একমাত্র পতিই জীবন।
প্রাণ গেলে দেহ আর থাকে না কখন।
অতএব হুতাশনে ত্যজিব জীবন ॥
কিন্তু এক কথা আমি বলি ভগ্নীগণে।
পতির সমান ধন নাহি ত্রিভুবনে ॥
পতির সেবায় যাঁর থাকে অনুরক্তি।
ইহ কালে সুখ তাঁর পরলোকে মুক্তি ॥
পতিকে স্মরিয়া আমি ত্যজি গো জীবন।
পরলোকে পাই যেন পতির-চরণ ॥

মনোরঞ্জন ও মনোহর দূর হইতে দেখিতে পাইলেন একটি স্ত্রীলোক এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অগ্নির চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। তখন তাঁহারা দুই বন্ধুতে ভয়ে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া দ্রুত পদে সেই খানে আসিয়া দেখিলেন—আলুলায়িত কেশে মলিন বেশে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা মনোরমা এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে আত্মহত্যায় প্রস্তুত হইয়াছেন। মনোরঞ্জন মনোরমার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"প্রিয়তমে! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত

হও, এই তোমার হতভাগ্য মনোরঞ্জন আসিয়াছে।" এই বলিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া প্রিয়তমার গল দেশে বেষ্টন করিলেন। মনোরমা "মনোরঞ্জন" নাম শ্রবণ করিয়াই যেমন নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, অমনি আমার জীবনসর্ব্বস্ব এলো কি! এই বলিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত এবং মূর্চ্ছিত হইলেন।

মনোরঞ্জন মনোরমাকে চেতনাশূন্য দেখিয়া মনোহরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—"সখে! প্রাণপ্রতিমা মনোরমা বুঝি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! দেখিতে দেখিতে যে চেতনাশূন্য হইল, হায়! এই কালসর্প স্পর্শ করিবামাত্র প্রিয়তমার প্রাণবায়ু বাহির হইল! হায়, আমি কি করিলাম—স্ত্রীহত্যা করিলাম!" এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। মনোহর জলাশয় হইতে জল আনয়ন করিয়া মনোরমার মুখে দিলেন এবং উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই মনোরমার মূর্চ্ছা দূর করিতে পারিলেন না। নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া জানিলেন যে মনোরমা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সমাপ্ত।

ভূমিকা।

'মনোরমা' পাঠকগণের হস্তে অর্পিত হইল। গ্রন্থকর্ত্রীর অভিমত না হইলেও আমি যত্ন পাইয়া এখানি প্রকাশিত করিলাম। এতৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় বিবৃত করিলাম।

প্রথমেই বলা ভাল, যাঁহারা রসভাব-মাধুর্য্য, অলঙ্কার-বৈচিত্র্য, প্রভৃতি কাব্যশরীরের শোভা ও সৌষ্ঠব দেখিতে চান, 'মনোরমা' তাঁহাদের জন্য নহে; কারণ, মুগ্ধস্বভাবা কুলকামিনীরা কি ঐ সকল সৌন্দর্য্যের জন্মভূমি? গভীর-চিন্তাশীল পাঠক! এখানি আপনাদের জন্যও নহে; কারণ, মনোরমা-সদৃশী সরলা বালার কোমল মন আপনাদের কঠোর চিন্তাশক্তির তৃপ্তিকর সামগ্রী কোথায় পাইবে? এতৎপাঠে নবন্যাস-বুভুক্ষু নবাদলেরও আনন্দের সম্ভাবনা অল্প।

'মনোরমা' দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা; সম্পত্তির মধ্যে এক সরল, কোমল, ও উদার মন। আর সচ্চরিত্র স্বামীর সহবাসকে যদি 'উচ্চশিক্ষা' বলেন, তবে 'মনোরমা' সে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

সংক্ষেপে গ্রন্থ-নায়িকার এইমাত্র পরিচয় দিলাম। এক্ষণে এতৎপাঠে কাহার আনন্দ লাভের সম্ভাবনা? পাঠকগণ! আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এরূপ প্রকৃতির লোক থাকেন, যিনি, একটি অকৃত্রিম গ্রাম্য দৃশ্যের জন্য শত-শত-আহার্য্য-শোভা-পরিবারিত নাগরিক দৃশ্যরাশি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত; যিনি, সভ্যতা ও বিলাসিতার প্রলোভনপূর্ণ নিমন্ত্রণে কর্ণপাত না করিয়া প্রকৃতির অতি সামান্য দানকেও অসামান্য ও অমূল্য বলিয়া জ্ঞান করেন; যিনি, প্রিয়তমাকে বিবিধ রত্নময় আভরণে ভূষিত অপেক্ষা কতিপয় মানসিক আভরণে সজ্জিত দেখিলে প্রীত হয়েন; এই 'মনোরমা' প্রকৃতপক্ষে তাঁহারি মনোরমা।

গ্রন্থকর্ত্রী আমার পরম আত্মীয়, এবং সম্বন্ধে গুরুজন; তিনি সাংসারিক কার্য্যের অবসরে এইখানি রচনা করিয়াছেন। এখানি মুদ্রিত ও সাধারণ-সমীপে প্রকাশিত হইবে ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অবসর-কাল স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবে এই উদ্দেশে নিজের চেষ্টায় যতটুকু সাধ্য পড়িতে শিখিয়াছেন, এবং পাঠানুশীলনকালে অন্তঃকরণে যে সকল কোমল ভাবের আবির্ভাব হইত, সময়ে সময়ে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব

এই 'মনোরমা' তাঁহার নবোদিত সুকুমার ও অপরিস্ফুট সদ্ভাব-বৃক্ষের প্রথম মঞ্জরী। আমি একদা তাঁহার এই অযত্ন-রক্ষিত রচনার কিয়দংশ পাঠ করিলাম; দেখিলাম, ইহাতে নিরীহ গ্রাম্য গৃহস্থ-জীবনের ও সরল পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়ের কোমল ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে; কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী নিজে মুগ্ধস্বভাব ও অমায়িক বলিয়া সে সকল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করেন নাই। পরে ভাবিলাম, বুঝি গ্রন্থকর্ত্রী আমার বিশেষ আত্মীয় বলিয়াই তাঁহার লেখাটুকু আমার মিষ্ট লাগিল, এই ভাবিয়া আমার দুই একটি অপক্ষপাতী বন্ধুকে ইহা পড়িয়া শুনাইলাম; সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইলেন। অনন্তর গ্রন্থ-কর্ত্রীর একপ্রকার অনিচ্ছা বা অসম্পূর্ণ ইচ্ছাতেই এখানি মুদ্রিত করিলাম। মুদ্রাঙ্কনকালে দুই এক স্থলে বর্ণাশুদ্ধির সংশোধন ভিন্ন আর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোমলতা ও সরলতা ভিন্ন মনোরমার অন্য গুণ নাই; এক্ষণে কোমল ও সরল প্রকৃতির পাঠকেরা ইহার অনাদর না করিলেই মনোরমাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিব।

আমার মতে—কণ্টকময় এই দুঃখের সংসারে যদি 'কাব্য,' 'কুসুম,' 'কামিনী,' এবং 'কোমল ও সরল মন,' এই চারি পদার্থ না থাকিত, তবে এই জীর্ণারণ্যে কেবল দুরন্ত শ্বাপদকুল বিহার করিত—'নরসমাজ' এ নামও থাকিত না। এই চারিটি থাকাতেই সংসার আমাদের বাসযোগ্য হইয়াছে। আবার বলি;—'কাব্য,' 'কুসুম,' 'কামিনী,' এবং 'কোমল ও সরল মন'; এই চারিটির মধ্যে শেষেরটি অর্থাৎ 'কোমল ও সরল মন' 'ভোক্তা,' এবং প্রথম তিনটি 'ভোগ্য'। আমার সঙ্কেত-বাক্য, বোধ হয়, সকলের পক্ষে সুগম হইল না; এজন্য একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। যাঁহার 'কোমল ও সরল মন' নাই, তিনি, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিকুলের অপূর্ব্ব ভাব-ভাণ্ডারে, বিকসিত কুসুমবনের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে, এবং মুগ্ধস্বভাব কামিনীকুলের মধুপূর্ণ হৃদয়-ভাণ্ডারে, কদাচ প্রবেশ করিতে পারিবেন না; সুতরাং সেই সেই রসের 'উপভোগ' তাঁহার অদৃষ্টে নাই। ইত্যলং পল্লবিতেন।

কলিকাতা।
২০এ আষাঢ়
১২৮১ সাল।

প্রকাশক
শ্রীসং——

মনোরমা।

(আখ্যায়িকা)

অর্থাৎ

সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র স্ত্রীজাতিদ্বারা সংসারাশ্রম কিরূপ
সুখের স্থান হয় তদ্বিষয়ক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

"গুণএব হি রূপস্য মণ্ডনং কুরুতে স্ত্রিয়ঃ।
গৌরবং সৌরভেনৈব জায়তে কুসুমশ্রিয়ঃ॥"

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী
প্রণীত।
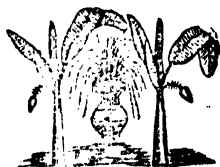
কলিকাতা।

নূতন ভারত যন্ত্রে
শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়-মুদ্রিত।

মূল্য ॥৴০ দশ আনা মাত্র।

উৎসর্গপত্র।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরঃ
শরণম্।

পরমারাধ্য পরমপূজনীয়—
আর্য্যপুত্র!

১২৭২ সালে আমি মনোরমার আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হই, এবং ঐ সালেই ইহা সমাপ্ত করি। কিন্তু ইহা মুদ্রাঙ্কনের নিতান্ত অযোগ্য জানিয়া এপর্য্যন্ত কাহাকেও না দেখাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে, আমি যাহাকে সন্তানের ন্যায় ভাল বাসি, বারম্বার সেই স্নেহাস্পদের অনুরোধে অগত্যা মুদ্রিত করিতে হইল। এক্ষণে চির-দুঃখিনী মনোরমাকে আপনার চরণে অর্পণ করিলাম। আমার মনোরমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন এই প্রার্থনা।

আপনার
চরণাশ্রিতা
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী।